দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

ভূত চতুর্দশী তথা রূপ চতুর্দশী
আলো, বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের
মেলবন্ধন — পৃঃ ৩১

একমাত্র লক্ষ্য হোক
'বিকশিত ভারত-২০৪৭'
— পৃঃ ১১

৭৯ বর্ষ, ৭ সংখ্যা।। ২ নভেম্বর, ২০২৬।। ১৫ কার্তিক, ১৪৩৩।। [illegible]।। দীপাবলী সংখ্যা।। website : www.eswastika.com



कुटुंब प्रबोधन

जीवन यात्रा की नौका है परिवार,
जिसमे हम सात जन साथ हैं,
भवसागर पार करने हेतु



लक्ष्य

संयुक्त परिवार	संगठित, सशक्त, सुरक्षित परिवार
स्वस्थ परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार
सुसंस्कृत परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार
आदर्श परिवार	समर्थ, संपन्न, समृद्ध परिवार

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

দীপাবলী সংখ্যা

৭৯ বর্ষ ৭ সংখ্যা, ১৫ কার্তিক, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

২ নভেম্বর - ২০২৬, যুগাব্দ - ৫১২৮

Website : www.eswastika.com



সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশচন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

ঢিলের বদলে পাটকেল খেতেই হয়
'যস্মিন দেশে যদাচার' □ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৬

দিদি গো! শুভেন্দু হতে পারলেন না □ সুন্দর মৌলিক □ ৭

মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে বিষ খাওয়ানো হচ্ছে, আর কতদিন চলবে? □ রমা বন্দ্যোপাধ্যায় □ ৮

একমাত্র লক্ষ্য হোক 'বিকশিত ভারত—২০৪৭'
□ সুজিত রায় □ ১১

এক জেহাদির ৯/১১-র পরিকল্পনা ব্যর্থ করলেন হিন্দু পাইলট স্মিত মচ্ছর □ মণীন্দ্রনাথ সাহা □ ১৪

এক মহাজীবনের নাম 'ভগিনী নিবেদিতা'
□ সৈকত নিয়োগী □ ১৫

দক্ষিণ দিনাজপুরের ত্রিমোহিনীর শ্রীশ্রীবিকট কালীমাতার মন্দির আজও স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে রয়েছে □ বিদ্যুৎ সরকার □ ১৭

ভূত চতুর্দশী তথা রূপ চতুর্দশী : আলো, বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের মেলবন্ধন □ সাগরিকা ভট্টাচার্য □ ৩১

ভারতের এক গুপ্ত সাধিকার কথা—মাতঙ্গী মাঈ
□ রণজয় বিশ্বাস □ ৩৩

দীপাবলী ও শ্যামামায়ের আরাধনা □ মৌ চৌধুরী □ ৩৪

চোরবাগান মিত্র পরিবারের ৩৭৭ বছরের প্রাচীন কালীপূজা
□ সপ্তর্ষি ঘোষ □ ৩৫

শক্তি সাধনা, শাক্ত পদাবলী □ নন্দলাল ভট্টাচার্য □ ৩৬

বরেণ্য বিপ্লবীদের স্মৃতিবিজড়িত পাথুরিয়াঘাটার বড় কালীপূজা
□ সৌম্যব্রত দাশগুপ্ত □ ৩৯

সংগঠিত, পুরুষার্থসম্পন্ন ও বিজয়শালিনী শক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে সঙ্ঘ এগিয়ে চলেছে : ডাঃ মোহনরাও ভাগবত □ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ :

□ চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ অঙ্গনা : ২১ □ সুস্বাস্থ্য : ২২ □ সমাবেশ সমাচার : ২৩-৩০ □ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ □ স্মরণে : ৪৭

প্রচ্ছদের ছবিটি নৈহাটির বড়মা'র মূর্তি

স্বস্তিকার সকল পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, বিজ্ঞাপনদাতা, প্রচার প্রতিনিধি ও শুভানুধ্যায়ীকে জানাই শুভ বিজয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

—স্বস্তিকা পরিবার

প্রকাশিত হবে ৯ নভেম্বর ২০২৬

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ৯ নভেম্বর ২০২৬

পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়

প্রখ্যাত দার্শনিক, সমাজচিন্তক, অর্থনীতিবিদ ও বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়। ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অপরিসীম। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় জাতীয় জীবনে তাঁর অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করবেন কয়েকজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ঊনআশিতম বর্ষ পূর্ণ করল। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

আলোর উৎসবে আলোয় উদ্ভাসিত হউক ভুবন

সেই কোন প্রাচীনকালে ঋষিকণ্ঠে উদ্‌গীত হইয়াছিল, অসতো মা সদ্‌গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।' অসত্য, অন্ধকার ও মৃত্যু — এই তিনটি হইতেই উত্তরণের উপায় হইল আলো অর্থাৎ জ্ঞান। এই তিনটিই অন্ধকারের প্রতীক। আলো হইল জ্ঞান, সত্য ও দিব্য চেতনার প্রতীক। আলোর উৎসব দীপাবলী হইল মনুষ্য জীবনের যাবতীয় ক্ষুদ্রতা বিদূরিত করিয়া জ্ঞানের আলোকে পূর্ণ করিবার বার্তা। ভারতবর্ষের সাধনাই হইল অসত্য হইতে সত্যের দিকে, অন্ধকার হইতে আলোর দিকে এবং মৃত্যু হইতে অমরত্বের দিকে অগ্রসর হওয়া। সেই কারণেই ভারতীয় সংস্কৃতিতে কোনো শুভকার্যের প্রারম্ভেই আলোক প্রজ্বলিত করিবার রীতি রহিয়াছে। যুগ যুগ ধরিয়া এই রীতি অব্যাহত রহিয়াছে। ত্রেতাযুগে পিতৃসত্য পালনার্থে শ্রীরামচন্দ্রের চতুর্দশ বর্ষ বনবাস জীবন সমাপন্তে অযোধ্যায় প্রত্যাগমনকালে অযোধ্যাবাসী সমগ্র নগরী আলোকমালায় সজ্জিত করিয়া সেই নরচন্দ্রমাকে বরণ করিয়াছিল। আবার দ্বাপরযুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নরকাসুর বধের স্মরণে দ্বারকাবাসী নগরীকে দীপমালায় সজ্জিত করিয়াছিল। তখন হইতেই কার্তিকী অমাবস্যাতিথি আলোর উৎসবে পরিণত হইয়াছে। সেই ঘটনার স্মরণে আজও ভারতবাসী উৎসবে মাতিয়া ওঠে। ভারতবর্ষের জৈন সমাজ মহাবীর তীর্থঙ্করের নির্বাণলাভের স্মরণে আলোক প্রজ্বলিত করিয়া দিনটি পালন করিয়া থাকেন। বৌদ্ধ সমাজে দিনটি পালিত হইয়া থাকে ভগবান বুদ্ধের অহিংসা, শান্তি ও করুণার বাণী স্মরণ করিয়া। শিখ সমাজে দিনটি 'বন্দি ছোড়' দিবস রূপে পালিত হইয়া থাকে। এই দিনে ১৬১৯ খ্রিস্টাব্দে ষষ্ঠ শিখগুরু হরগোবিন্দ সিংহ মুঘল বাদশা জাহাঙ্গিরের দুর্গ হইতে নিজেকে এবং ৫২ জন বন্দি রাজাকে মুক্ত করিয়াছিলেন। তাহারই স্মরণে শিখ সমাজে আলোর উৎসব পালিত হইয়া থাকে।

দীপান্বিতা অমাবস্যার পুণ্যতিথিতে বঙ্গপ্রদেশ তথা পূর্ব ভারতে শ্রীশ্রীকালী বা শ্যামাপূজার আয়োজন করা হইয়া থাকে। এই তিথি শক্তি আরাধনার শুভ মুহূর্ত বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে। মা কালী শক্তি ও সৃষ্টির দেবী। তিনি সাধকের অভ্যন্তরস্থ অহঙ্কার, অজ্ঞতা, নীচতা প্রভৃতি অবগুণ ধ্বংস করিয়া তাহাকে শুদ্ধ করিয়া তোলেন। বঙ্গপ্রদেশ-সহ পূর্ব ভারত শক্তি সাধনার পীঠস্থান বলিয়া পরিগণিত। ৫১ শক্তিপীঠের ১৩টি পশ্চিমবঙ্গেই অবস্থিত। বহু শতাব্দী ব্যাপী কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, কমলাকান্ত, বামাক্ষ্যাপা, রামপ্রসাদের ন্যায় মহান সাধকগণের সাধনা এই ভূমিকে ধন্য করিয়াছে। কার্তিকী অমাবস্যায় পূর্ব ভারত ব্যতীত সমগ্র দেশে লক্ষ্মী ও সিদ্ধিদাতা গণেশের পূজা করা হইয়া থাকে। বঙ্গদেশেও বিভিন্ন স্থানে কালীপূজার সহিত লক্ষ্মীপূজাও হইয়া থাকে। মা লক্ষ্মী ও মা কালীর আরাধনার পূর্বে অলক্ষ্মী বিদায়ের বিধি রহিয়াছে। মা কালী ও মা লক্ষ্মী একই মহাজাগতিক শক্তির দুইটি ভিন্ন রূপ। কলিকাতায় কালীঘাটে মা কালীকেই এই দিনে লক্ষ্মীরূপে পূজা করা হইয়া থাকে। শ্রীশ্রী কালীপূজা বা দীপাবলী যাহাই হউক না কেন, ইহা মূলত আলোর উৎসব। ভারতীয় সংস্কৃতির এই আলোর উৎসব আজ ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করিয়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিস্তার লাভ করিয়াছে। এমনকী সেই সব দেশে দিনটিকে সরকারি ছুটির দিন হিসাবেও ঘোষণা করা হইয়াছে। কয়েক বৎসর যাবৎ আমেরিকার হোয়াইট হাউসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট স্বয়ং প্রদীপ প্রজ্বলন করিয়া এই উৎসবের সূচনা করিতেছেন। দীপাবলী উপলক্ষ্যে লন্ডনের টেমস নদীর তীর, ট্রাফালগার স্কোয়ার, দুবাইয়ের বুর্জ খলিফা, অস্ট্রেলিয়ার অপেরা হাউসের ন্যায় স্থানগুলি আলোকমালায় সজ্জিত করা হইতেছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদর দপ্তরেও এই উৎসব পালন করা হইতেছে। ভারতীয় সংস্কৃতির আজ যে বিশ্বসঞ্চার ঘটিয়াছে, প্রতিটি ভারতবাসীর নিকট তাহা অত্যন্ত গর্বের বিষয়। দীপাবলী উৎসবে সকলের মন আলোয় উদ্ভাসিত হউক, ভেদ বিভেদ বিদূরিত হইয়া বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হউক— জগজ্জননী মা কালীর নিকট এই প্রার্থনা।

সুভাষিতম্

ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ।। (শ্রীগীতা ১৪।১৮)

অর্থ ঃ সত্ত্বগুণে স্থিত ব্যক্তি স্বর্গাদি উচ্চলোকে গমন করেন, রজোগুণে স্থিত ব্যক্তি মধ্যলোকে অর্থাৎ মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন এবং তমোগুণের কার্যরূপ নিদ্রা-প্রমাদ-আলস্যাদিতে স্থিত তামসিক ব্যক্তিরা অধোগতি অর্থাৎ কীট, পশু আদি নীচ যোনি বা নরক প্রাপ্ত হয়।

ঢিলের বদলে পাটকেল খেতেই হয়

‘যস্মিন দেশে যদাচার’

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

‘মার্ক্সবাদ সর্বশক্তিমান কারণ তা সত্য!’ লাঠির জোরে তা প্রমাণ করতে হয়। ৩৪ বছর ধরে বিদেশি বামেরা এ কথাই বলত। আলোচনার জন্য বলা ভালো যে, কেন পেশি বা পশুশক্তির বদলে মনুষ্যত্ব স্থাপন করা উচিত। ফি’ বছর এরাজ্যের গ্রাম ও শহরে হিন্দু সংস্কৃতিকে পদদলিত করে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের স্টল তছনছ করেছিল বিদেশি ভামেরা। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে পায়ের তলায় মাড়িয়ে নাস্তিকতার পূজা আর ভারতীয় সংস্কৃতির বিরোধিতা করত তারা। তাই হিন্দু সংস্কৃতি-মূলক সমস্ত বইপত্রকে টার্গেট করেছিল তারা। সে তঞ্চককুল এখন বলছে— পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র যে সত্য তা প্রমাণ করতে কেন মানুষ খুন করতে হবে। অথচ তাদের কাছে যা কিছু হিন্দু তাই ছিল অচ্ছুত। দুর্গাপূজার সামনে স্টলে বসে তারা নিরীশ্বরতার ব্যবসা করে। ধর্মকে যারা আফিম বলে মানে--- তারাই মন্দির ও পূজামণ্ডপের সামনে মার্ক্সীয় সাহিত্যের পসরা সাজিয়ে ‘বেওসা’ চালাতে চাইছে। সেই মার্ক্সবাদী শ্রেষ্ঠীদের মানুষ রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেছে। এখন তারা ফিনিক্স পাখি হয়ে ওঠার স্বপ্নে বিভোর! মানুষকে তারা প্রতিদিন বিপথে চালাতে চাইছে। সর্বস্তরে হিন্দু ধর্মের বিরোধিতা করেও রাজনৈতিক ও আইনি অধিকারের দোহাই দিয়ে ‘বই’-এর নামে মাথা তুলতে চাইছে। হিন্দু সংস্কৃতির উদারতাকে তারা অপব্যবহার করতে চাইছে। কল্পলোকের গল্প ফেঁদে মার্ক্সবাদী বই বিক্রির উদ্ভট তত্ত্ব আওড়াচ্ছে। মার্ক্সবাদের গোরুকে গাছে তুলে ‘সামাজিক বিজ্ঞান’ হিসাবে বিক্রি করতে চাইছেশ্রেণীবিদ্বেষ ছড়ানোর জন্য।

‘বইপত্র’-এর ওপর আঘাত নিয়ে এখন অনেকে সরব হয়েছেন। এরাজ্যে বামপন্থীদের নতুন ভিক্টিম-কার্ড হিসাবে আমদানি হওয়ার কারণে অনেকেই বামেদের কলঙ্কিত ইতিহাস হয়তো জানেন না। নতুন প্রজন্ম-সহ অনেকেই অবগত নন যে, কীভাবে হিন্দুসমাজ ও সনাতনী ভাবনার ওপর চৌত্রিশ বছর ধরে আঘাত করা হয়েছে। এছাড়াও গত ১৫ বছর ধরে কীভাবে হিন্দু সংস্কৃতির অপমান করে মুসলমান ভোটব্যাংক বানানো হয়েছে। ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থার সময় পাশ্চাত্যবাদী ইন্দিরা গান্ধী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের লেখা বেশ কিছু গান ও রবীন্দ্র রচনাবলী নিষিদ্ধ করেন। বাম জমানায় যে ভয়াবহ অত্যাচার বামপন্থা-ভিন্ন বইপত্রের ওপর হয়েছে— আজকের তোতা উকিলরা তার বিরুদ্ধে বোল ফোটাতো না। মার্ক্সবাদ-বিরোধী বা বামপন্থা-বিরোধী বইয়ের লেখক ইসাইয়া বার্লিন, হানা আরেন্ট বা কার্ল পপার রচিত বইগুলিকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে নিশ্চুপে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কেবল পাওয়া যেত হ্যারল্ড লাস্কির ‘গ্রামার অফ পলিটিক্স’। মার্ক্সবাদী হিসাবে লাস্কি সে বই লিখেছিলেন। পরে বামপন্থা থেকে সরে যান। তাই তার রচিত অন্য বইগুলি গ্রন্থাগার থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। কমিউনিস্ট রাজনৈতিক নেতৃত্বের শূন্যতার সুযোগ নিয়ে জনৈক তোতা উকিল লজ্জার মাথা খেয়ে কলকাতার মেয়রের চেয়ারে বসেছিলেন। লোভের পরবশ হয়ে এক জাঁদরেল বাম মন্ত্রী পৌরসভার ভোট লড়ে হেরে যান। চেয়ার হারানোর ভয়ে তারা বাম জমানায় বইপত্রের ওপর সংঘটিত অন্যায়ের কোনো প্রতিবাদ করেননি। সব হারানোর দেশে পৌঁছে তোতা উকিল আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। প্রকাশ্যে গোমাংস খেয়ে বুদ্ধিহীনদের দলের কার্যকর সদস্য হিসাবে প্রমাণ করেছিলেন যে, তিনি কেন ‘গো-পালন’ ভবনে স্থান পাওয়ার যোগ্য।

তবে এহেন অর্ধ-মস্তিষ্ক দলের বিরুদ্ধে পেশি শক্তির ব্যবহার যে অপরিহার্য নয়— এমন ভাবনাকে সমর্থন জানিয়েও বলতে হবে যে, কিছু ক্ষেত্রে লাঠ্যৌষধির প্রয়োজন রয়েছে। তবে তা যেন আর এক ব্যবসার বা দম্ভের অঙ্গ না হয়ে ওঠে। যেমন হয়ে উঠেছিল বিদেশি বাম আর জেহাদি তস্করদের জমানায়। সে সময় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শখায় শাখায় মার্ক্সবাদী হার্মাদরা গিয়ে হুমকি দিত। সুযোগমতো আক্রমণ চালাত। বামপন্থীদের ইতিহাস দেখলে সহজেই বলা যায় যে, তারা একমুখী শিক্ষা বা মগজধোলাইয়ের অনুসারী। চীন ও রাশিয়াতে নোবেল বিজয়ী বো জি লাই ও শাখারভকে জেলে আটকে রাখা হয় নয়তো ওই পুরস্কারের মনোনয়ন থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য করা হয়। একসময় হিন্দুবিরোধী ও ভারত-বিরোধী বামেরা পশ্চিমবঙ্গে অনেক স্বয়ংসেবককে হত্যা করে। হিন্দুত্বের আদর্শে নিবেদিতপ্রাণ, রাষ্ট্রবাদী সরকার এরাজ্যে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর তার প্রত্যাঘাত হওয়াটা তাই কেন যে অনেকের কাছে ‘অস্বাভাবিক’ মনে হচ্ছে সেটা ভাবতে অবাক লাগে। এটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার--- যে বা যারা বামপন্থীদের মার্ক্সীয় বইয়ের আড্ডায় হামলা চালিয়েছে, তারা সকলেই যে আদর্শভিত্তিক কাজে ব্রতী হয়ে তা করেছে এমন নয়। তবে কিছুদিন আগে তৃণমূলনেত্রী-বিরোধিতা যেমন তুঙ্গে উঠেছিল, আগামীদিনে ঠিক তেমনই ‘ভাম বিরোধিতা’ তার থেকেও মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। পাশের রাজ্য ত্রিপুরা তার সঠিক নিদর্শন।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

দিদি গো!
শুভেন্দু হতে পারলেন না

গোহারাযু দিদি,

রাজ্যে ফের পুলিশি 'এনকাউন্টারে' মৃত্যু হলো ধর্ষণ-হত্যায় অভিযুক্তের। শুভেন্দু অধিকারী নেতৃত্বাধীন পশ্চিমবঙ্গ সরকার বুঝিয়ে দিল, নারীর সম্মান নষ্ট করলে পরিণতি ভয়ানক। সকালে জমা, বিকেলে খরচ। আর হয়তো, এক ধাক্কায় বেড়েও গিয়ে থাকতে পারে এরাজ্যের বর্তমান সরকারের জনপ্রিয়তা। মানুষের প্রশ্ন এসব মামলায় কোনো বিচার হয় নাকি? ক'জন ধর্ষক সাজা পায়? কী বিচার পেলেন কামদুনির নির্যাতিতা? আদালতে কবে, কী প্রমাণ হবে, কে জানে? এদের জন্য কোনো মানবাধিকার প্রযোজ্য হতে পারে না। সকালে 'জমা' করে বিকেলে 'খরচ' করো।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরের পর এবারের ঘটনাস্থল উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটা। দুই ক্ষেত্রেই অভিযুক্তকে নিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করতে গিয়েছিল পুলিশ। সে সময়ে অভিযুক্ত যুবক পুলিশের বন্দুক ছিনিয়ে গুলি চালায়। আত্মরক্ষার্থে পালটা গুলি চালায় পুলিশও।

গাইঘাটায় বিবস্ত্র অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছিল এক কিশোরীর ক্ষতবিক্ষত দেহ। বয়স মাত্র সতেরো। ধর্ষণ করে হত্যার ঘটনায় ওই পরিবারের আত্মীয় প্রহ্লাদ দাশকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এর আগে গত জুলাইয়ে বারুইপুরে নাবালিকাকে গণধর্ষণ করে হত্যার ঘটনায় অভিযুক্ত প্রভাস মণ্ডলেরও মৃত্যু হয়েছিল পুলিশের গুলিতে। ওই নাবালিকার বয়স ছিল বারো। দিদি, এই দুই ক্ষেত্রে আপনি হলে কী বলতেন! ছোটো ঘটনা! মেয়েটারই দোষ! পারিবারিক গোলমাল!

আপনার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ফারাক কোথায় জানেন! তিনি ক্ষমতায় এসেই কড়া পদক্ষেপ, ক্যাপিটাল পানিশমেন্টের হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। সকালে 'জমা' করে বিকেলে 'খরচ' করো। আপনার সমর্থক আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বারুইপুরের ঘটনায় বলেছিলেন, 'এনকাউন্টার করে মেরে ফেলা হলো, উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্ত তথ্য লোপাট করা।' আমি বলি কী, আইনে এনকাউন্টারের বিধানও রয়েছে। কোনো অপরাধী যদি পালাতে গিয়ে পুলিশের উপর হামলা করে তখন তাকে এনকাউন্টার করা যায়। দিদি গো, এখনকার রাজ্য সরকার যা বলছে, তাতে আমি ভরসা রাখছি। আমি সব সময় চাই ধর্ষকদের চূড়ান্ত শাস্তি হোক।

আসলে আমাদের রাজ্যের পুরনো রেকর্ড তো ভালো নয়। কামদুনি গণধর্ষণ মামলায় ১৪ বার সরকারি আইনজীবী বদল হয়েছে। বিচার আসবে কী করে? ২০২৩ সালে কলকাতা হাইকোর্ট চার জনকে বেকসুর খালাস করে দেয়। মৃত্যুদণ্ড পাওয়া দু'জনের সাজা কমিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। পুলিশ প্রমাণ দাখিল করেনি। কিন্তু সেটা কার নির্দেশ! সবাই বলছে, ধর্ষণকে যিনি ছোটো ঘটনা বলতেন তাঁর নির্দেশে! আমিও না আজকাল সেই রকমই ভাবি। কারণ, আমি জানি ১৫ বছরে আপনার নির্দেশ ছাড়া এই রাজ্যে পাতাও নড়ত না।

> 'ধর্ষণ' একপ্রকার সামাজিক ব্যাধি। এই সামাজিক ব্যাধিকে দেশ থেকে নির্মূল করতে হলে বিকৃতকাম ধর্ষকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির নিদর্শন রাখতে হবে। যা প্রত্যক্ষ করে ভয়ে হাড় হিম হয়ে যায় মানুষরূপী পশুদের।

দিদি, আপনি ভুলে গেছেন কি, আপনার শ্রীযুক্ত ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই পুরনো 'নিদান'। আরজি কর কাণ্ডের পরে অভিষেক আইন এনে ধর্ষকদের এনকাউন্টার করার ফাঁকা আওয়াজ দিয়েছিলেন! আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে ছাত্র সমাজের নবান্ন অভিযানের সময় বলেছিলেন, পুলিশ কর্মীদের জায়গায় তিনি থাকলে মাথায় বা কপালে গুলি করতেন। মনে আছে দিদি!

কামদুনি, পার্কস্ট্রিট, মধ্যমগ্রাম, মালদহ, হাঁসখালি, কসবা ল' কলেজ..., তা হলে বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দুতে অনিবার্যভাবেই অবস্থান করে ধর্ষক-নরখাদকের দল। কত জন ধর্ষক সাজা পেয়েছে? ক'টি ক্ষেত্রে ধর্ষণের অভিযোগ পুলিশের খাতায় নথিভুক্ত করানো যেত? ধর্ষকের লোলুপ দৃষ্টি এড়িয়ে কবে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করতে পারবে পশ্চিমবঙ্গের নারীরা? কবে সুনিশ্চিত হবে মেয়েদের নিরাপত্তা? অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপরাধীদের দ্বারা ধর্ষিতার পরিবারকে হুমকির মুখে পড়তে হয় কেন! এই প্রশ্নগুলো তুলেই তো আপনাকে সরিয়েছে মানুষ।

'ধর্ষণ' একপ্রকার সামাজিক ব্যাধি। এই সামাজিক ব্যাধিকে দেশ থেকে নির্মূল করতে হলে বিকৃতকাম ধর্ষকদের অতি দ্রুত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির নিদর্শন রাখতে হবে। যা প্রত্যক্ষ করে যাতে ভয়ে হাড় হিম হয়ে যায় মানুষরূপী পশুদের। না পশু নয়। ওরা সাধারণত ধর্ষণ করে না। নিজেদের ভয়ঙ্কর অন্তিম পরিণতির কথা ভেবে কোনো নারীর উপরে এই ধরনের নির্যাতন করার আগে অন্তত যাতে শতসহস্র বার ভাবে নরখাদকের দল। তবেই হয়তো এই ব্যাধির শিকড় উপড়ে ফেলা সম্ভব হবে সমাজের বুক থেকে। চিরতরে।

তাই হয় তো এটাই সঠিক পথ। সকালে 'জমা' করে বিকেলে 'খরচ'। □

মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে বিষ খাওয়ানো হচ্ছে, আর কতদিন চলবে?

এখনো পর্যন্ত চল্লিশটা রেস্টুরেন্ট ও খাবারের দোকানকে বন্ধ করা হয়েছে। এদের ফুড লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে। এগুলি শহর কলকাতার ছবি। কলকাতা পুরসভার প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে জানিয়েছেন, 'মানুষের স্বাস্থ্যের সঙ্গে কোনো আপোশ নয়।'

রমা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাগাড়ের মাংস নিয়ে হইচই হয়েছিল, মনে আছে নিশ্চয়ই অনেকেরই। সেটা ছিল ২০১৮ সালের ঘটনা। যখন বিষয়টা প্রথম নজরে আসে, আমরা জানতে পারি। বজবজের ভাগাড় থেকে মরা কুকুর, বিড়াল, ছুঁচোও উধাও হয়ে যাচ্ছিল কোনো অজ্ঞাত কারণে। এলাকার লোকজন লক্ষ্য করেন ভোররাত্রে ভাগাড়ের গেটের সামনে দিয়ে ভ্যান চলে যাচ্ছে প্রায়শই। তাঁদের সন্দেহ হয়। ক্রমশ সন্দেহ বাড়তে থাকায় একদিন তাঁরা অনেকে মিলে ভ্যান আটকান। তারপর তাঁরা যেটা দেখেন, তাতে তাঁদের চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায়। প্যাকেটের উপর প্যাকেটে ভরে ভরে মৃত পশুপাখির শরীর পাচার করা হচ্ছে।

এক নামকরা মাংসবিক্রেতা, যার নামই হয়ে গিয়েছিল 'মাংস-বিশু'। সে এই ভাবেই ভাগাড়ের মাংস মানুষকে খাইয়ে তিন তলা বাড়ি করেছিল।

ভাগাড়ের মাংসের ব্যাপারটা জানাজানি হওয়ার পর তৎকালীন সরকার এসআইটি গঠন করে। তারপর কী হলো, আজও কেউ জানে না। বিষয়টি ক্রমশ ধামাচাপা পড়ে যায়। ওই সময় টাকা ফেললেই পাওয়া যেত ট্রেড লাইসেন্স। পূর্বতন সরকার আরও অনেক ক্ষেত্রের মতোই এক্ষেত্রেও একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে তুষ্ট রাখার জন্য এই অবৈধ ও মানবতাবিরোধী কাজ চালিয়ে যেতে দিয়েছে।

২০১৮ সালে 'মাংস-বিশু'-কে ধরা হয় আবার বেকসুর খালাসও হয়ে যায়। ২০১৯ সালে পুলিশ কোনো প্রমাণ দিতে না পারায় ২০২১ সালে আদালতে তার কারাদণ্ড খারিজ হয়ে যায়। এরপর সারা পৃথিবী কাঁপিয়ে এল ভয়ানক এক বিভীষিকা যার নাম 'করোনা'। সে এক সাংঘাতিক সময় গেছে। লক ডাউন চলল, প্রায় সব কিছু বন্ধ, দোকান পাট, স্কুল কলেজ, অফিস-আদালত, হোটেল, রেস্টুরেন্ট সবেরই ঝাঁপ ফেলা। এর ফলে হোম ডেলিভারি খুব বেড়ে গেল। ফোন তোলো, অর্ডার দাও, চিকেন, মাটন, এগ রোল থেকে বিরিয়ানি পর্যন্ত যে যা চায় খেতে, এক ঘণ্টার মধ্যে বাড়িতে এসে যাচ্ছে। সবাই, বিশেষ করে বাঙ্গালি তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছে, কিন্তু কী খাদ্য তারা উদরস্থ করছে, কখনো ভেবে দেখেছে কি?

২০১৯ থেকে ২০২২ এই চার বছরে ভাগাড়ের মাংসের ব্যবসা কোভিডের সুযোগে ফুলেফেঁপে উঠেছিল, তারই মধ্যে ২০২১-এ এসে গেল বিধানসভা নির্বাচন। ভোটের হাওয়ায় ভাগাড়ের কথা মানুষ ভুলে গেল। নানা ধরনের কারচুপি করে সিপিএমের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী তৃণমূলীরা আবার ক্ষমতা দখল করল।

নতুন সরকার আসার পর পরিস্থিতি বদলেছে ২০২৬ সালে। পালা বদলের পর মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন যে দুর্নীতির প্রশ্নে বর্তমান সরকার জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করবে, সেটাই করা হচ্ছে। বিভিন্ন স্থানে, শহরে, মফস্সলে, গ্রামে সর্বত্র বিভিন্ন পুরসভার তরফ থেকে হানা দেওয়া হচ্ছে।

এ পর্যন্ত ৫৯২টি রেস্টুরেন্টে হানা দেওয়া হয়েছে। অসংখ্য বেকারি থেকে কেক বানাবার ডিম পাওয়া গেছে, যেগুলি পচা। চায়না টাউনে রান্নাঘরে বানিয়ে রাখা গ্রেভি— ফ্রিজ থেকে উদ্ধার হয়েছে। ১৫২৫টা হোটেলে পোকা ধরা মাংস পাওয়া গেছে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার তিনশো আটষট্টিটা হোটেলে নোংরা কিচেনে পচা মাছ-মাংস মজুদ করা হয়েছে, তাই-ই মানুষকে টাকা নিয়ে খাওয়ানো চলছে।

বর্ধমান, নদীয়া, কোচবিহার, বজবজ, বহরমপুর, বীরভূম, হাওড়ার ডোমজুড়, উত্তর চব্বিশ পরগনা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা প্রভৃতি স্থানে ব্যাপক অভিযান চালানো হয় সরকারের তরফ থেকে। লোকে হয়তো স্তম্ভিত হয়ে যাবে জেনে যে, ওইসব জায়গার হোটেল, রেস্টুরেন্ট এমনকী গেস্ট হাউস পর্যন্ত মানুষকে অখাদ্য-কুখাদ্য খাওয়াচ্ছে। পূর্বতন দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার মোটা টাকার বিনিময়ে এই অবৈধ কারবার অবাধে চালাতে দিয়েছিল। সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য গোল্লায় থাক, টাকা তো আসছে, সরকারি কোষাগারে নয়, দাপুটে নেতা, মন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে পঞ্চায়েতের কুচোকাচা নেতারাও পকেট নয়, বস্তা ভরেছে, আলিশান বাড়ি বানিয়েছে, যারা আগে সাইকেলে যাতায়াত করতো, তাদের প্রাসাদের গ্যারেজে দেখা গেল মার্সিডিজ বেঞ্জ, টেসলা শোভা পাচ্ছে।

বর্তমান বিজেপি পরিচালিত সরকার ক্ষতিকর খাদ্যপানীয় বিক্রয়কারী হোটেল, রেস্টুরেন্ট, ধাবা, ফুটপাথের, গেস্ট হাউসের রান্নাঘরে কী আছে, কী নেই এই বিষয়টি গুরুত্বসহকারে তদন্ত করছে। খাদ্য নিরাপত্তা বিভাগের কর্মীরা বিভিন্ন জায়গায় হানা দিয়ে কী কী পেয়েছে ও জেনেছে, জানলে শিউরে উঠতে হবে।

বাদুড়িয়ার হোটেলে ফ্রিজ থেকে বেরিয়েছে পচাগলা মাংস, যার দুর্গন্ধে রেইড করতে আসা অফিসারদের কারও কারও বমনোদ্রক হয়েছে। বাগদার রেস্টুরেন্টে মেয়াদ উত্তীর্ণ পচা সস, পচা আলু সেদ্ধ ও পচা

কাসুন্দি।

বহু হোটেল-রেস্টুরেন্টে পচাগলা মাংস দিয়ে চিলি চিকেন, মাঞ্চুরিয়ান চিকেন, চিকেন পকোড়া পরিবেশন চলছে। মানুষ টাকা খরচ করে এই সব কুখাদ্য উদরস্থ করছে, বাচ্চাদেরও খাওয়াচ্ছে।

দুর্গন্ধ চাপা দেবার জন্য কিছু কেমিক্যালের সাহায্য নেওয়া হয়, সেগুলি লিভার ও কিডনির ক্ষতি করছে। মারাত্মক সব কেমিক্যাল। পূর্বতন সরকারের আমলে ব্যাঙের ছাতার মতো রেস্টুরেন্ট গজিয়েছিল, এখনো আছে, তবে এখন তাদের অনেকেরই শিরে সংক্রান্তি। এখন একটি সরকারি কমিটি হয়েছে বিষয়টির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করার জন্য। এখন ফুচকার জলও পরীক্ষার আওতায় এসে গেছে, সঙ্গে ফুচকা ভাজার তেল।

এ পর্যন্ত ৫৯২টা রেস্টুরেন্টে রেইড করা হয়েছে। চমকে উঠার মতো একটি তথ্য হলো, বহু জায়গায় থুতু মেশানো খাবার পরিবেশন হচ্ছিল— রুটিতে, বিভিন্ন ফলে। এমনকী আটা মাখা হতো আটার মধ্যে প্রস্রাব করে, এটা নাকি একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মজহবি রীতি। বিরিয়ানিতেও থুতু দিয়ে পরিবেশন করা হচ্ছিল।

পাঙুয়াতে প্লাস্টিকের প্যাকেটে মোড়া প্রচুর পচা মাংস হোটেলের ফ্রিজে পাওয়া গেছে। মেয়াদ পার হওয়া দুধও ব্যবহার করা হচ্ছিল, আটকাবার কেউ ছিল না, কে আটকাবে? সবই তো টাকার খেলা!

বহরমপুরে দেখা গেল হোটেলে বাসন মাজার জায়গায় রান্না হচ্ছে। তন্দুর রুটিতে থুতু দিচ্ছে, এ সবই এক বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকেদের কাজ। এটা তাদের পবিত্র রীতি, মানতেই হবে!

খাদ্যমন্ত্রী অশোক কীর্তনীয়া জানিয়েছেন যে এইসব অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তৃণমূল ও তার আগে কমিউনিস্টদের আমলে টাকা ফেললেই পাওয়া যেত ট্রেড লাইসেন্স, কোনো সমস্যা ছিল না। এখন সরকারি অফিসারদের হানার ফলে দেখা যাচ্ছে বাজারে মাছে ফরম্যালিন দিয়ে দীর্ঘদিন রেখে দেওয়া হচ্ছে বিক্রি না হওয়া পর্যন্ত।

সম্প্রতি পঁয়ষট্টিটি রেস্টুরেন্টের লাইসেন্স বাতিল হলো।

কলকাতার ট্যাংরায় পচা মাংস বাজেয়াপ্ত হয়েছে। অতীতে, হয়তো কারও কারও মনে আছে, বেহালায় ভেজাল তেল খেয়ে কয়েকশো মানুষ পঙ্গু হয়ে যায়, তদানীন্তন সরকারের তরফে কোনো হেলদোল দেখা যায়নি। তখন পুরসভা ছিল সরকারের পকেটে।

দমদম পার্কে কিছু নামি-দামি রেস্টুরেন্টে হানা দেওয়া হয়েছে, নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। দেখা গেছে বিরিয়ানিতে হোলির রং মেশানো হচ্ছে নির্দ্বিধায়। খাদ্য দপ্তরের অভিযানের ফলে এখন অসাধু ব্যবসায়ীরা ভীত, সন্ত্রস্ত। অভিযানের ফলে জানা যাচ্ছে যে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার তৈরি হচ্ছে। বাথরুমের সামনে গামলায় পনিরেও ছত্রাক গজিয়ে গেছে। সেগুলিই প্রচুর ভেজাল তেল, নানা ধরনের ভেজাল মশলা ও রং মিশিয়ে কষিয়ে রান্না করে পরিবেশন করা হচ্ছে। কয়েকটি হোটেলের ভিতরে ইঁদুর ও আরশোলার অবাধ বিচরণ।

বড়ো বড়ো রেস্টুরেন্টেও পচা মাংস কিলো কিলো পাওয়া গেছে, বেশ কিছু মাংসে ম্যাগট ঘুরে বেড়াচ্ছে। লেক মার্কেটে মাছের বাজারে অফিসারদের হানা, ফরম্যালিন দেওয়া মাছ পাওয়া গেছে। ফরম্যালিন মৃত মানুষের দেহকে বেশ কিছুদিন তাজা রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই কেমিক্যালটি শরীরে ঢুকলে ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, হাঁপানি হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। ত্বকের সমস্যাও দেখা দেয়, যেমন চুলকানি, র‍্যাশ বেরোনো ইত্যাদি।

ফরম্যালিন দেওয়া মাছ অস্বাভাবিক শক্ত হয়, আঁশগুলিও শক্ত হয়, কোনো আঁশটে গন্ধ পাওয়া যায় না। বাজার থেকে কিনে আনা মাছ কমপক্ষে পনেরো মিনিট জলে ভিজিয়ে রেখে, তার পর ভালো করে ধুয়ে গরম জলে পনেরো মিনিট ভিজিয়ে রাখার পর কড়া করে ভেজে রান্না করতে হবে, এছাড়া উপায় নেই। মাছকে ফরম্যালিন-মুক্ত করার জন্য এটুকু তো করতেই হবে।

পূর্বতন জমানায় মুসলমানদের আর্থিক ভাবে শক্তিশালী করার জন্য পাইকারি হারে ট্রেড লাইসেন্স দিয়ে দেওয়া হতো। দেখা যাচ্ছে এখন মাংসের ব্যবসায় বেশি দুর্নীতি। রিষড়ার হোটেলে উদ্ধার হলো রং করা বিরিয়ানি। বিরিয়ানির দোকানের সংখ্যা প্রচুর বেড়ে গিয়েছিল, তাতে কীসের মাংস ব্যবহৃত হচ্ছে, তা নিয়ে ক্রেতাদের কোনো মাথাব্যথা ছিল না। রসনার তৃপ্তি হলেই হলো, বিশেষত বাঙ্গালির কাছে। সঠিক লাইসেন্সিং হলে এই ধরনের ব্যবসা চলতে পারতো না। দুর্নীতির অংশীদার কিছু সরকারি অফিসারও দায় এড়াতে পারেন না। এরা মনে রাখেন না যে, ভেজাল অখাদ্য, কুখাদ্য তাদের পরিবারের সদস্যরাও খাবে--- না জেনে। সরকারি কর্তাদের মধ্যেও যে ঘুঘুর বাসা, তাদেরও এখন বোঝানো হবে যে কেউই আইনের ঊর্ধ্বে নয়।

এখনো পর্যন্ত বারোশো চব্বিশ কিলো পচা মাংস অফিসাররা ফেলে দিয়েছেন। ১৫২৫টি হোটেলে পোকাধরা মাংসের হদিশ মিলেছে। শুধু হোটেল, রেস্টুরেন্ট নয়, হাসপাতালগুলির অবস্থাও শোচনীয়। খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের অফিসাররা উত্তর আসানসোলের হাসপাতালের ক্যান্টিন পরিদর্শন করেছেন, সেখানকার অবস্থা দেখে তাদের চক্ষু চড়কগাছ। কিচেনে খাবারদাবার সবই খোলা পড়ে আছে, মাছি ভন্ ভন্ করছে, চারদিকে একটা ভ্যাপসা গন্ধ।

মিষ্টির দোকানও রেইড থেকে বাদ যায়নি। বিভিন্ন মিষ্টির দোকানের অভ্যন্তরে হানা দিয়ে অফিসাররা দেখলেন, ড্রেনের জলে ট্রে ধুয়ে তার ওপর মিষ্টি সাজানো হচ্ছে। প্রশাসনের ক্রমাগত অভিযানের ফলে ক্রমশ পর্দা ফাঁস হচ্ছে। মিষ্টির দোকানে বাসি সিঙ্গাড়া, কচুরি দেদার বিক্রি হচ্ছে।

বহরমপুরে নকল তেলের কারবার ধরা পড়েছে। ট্রাক বোঝাই খোলা তেল কারখানায় আসছে, কোনো একটি নামকরা ব্র্যান্ডের স্টিকার লাগানো হচ্ছে, খোলা বাজারের তেল ব্র্যান্ডেড্ নামে বিক্রি হচ্ছে। কাশিমবাজারে, রঘুনাথগঞ্জের বিভিন্ন স্থানে খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের আধিকারিকরা অভিযান চালিয়েছেন।

ইলিশ মাছ বিক্রিতেও লোককে প্রতারিত করা হচ্ছে, পদ্মার ইলিশ বলে সমুদ্রের ইলিশ চালানো হচ্ছে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, ছুটির দিনেও অভিযান



চালানো হচ্ছে এবং এটা চলবে।

বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ অফিসারেরাও রেইড চালাচ্ছেন। ভাঙড়ের হোটেল থেকে গামলা ভর্তি বিরিয়ানি পুলিশ ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছে। বিরিয়ানির মাংস সন্দেহজনক, আলুতেও মেশানো হচ্ছে রং। মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে ছেলেখেলা আর চলবে না। জেলায় জেলায় উদ্ধার হচ্ছে পচা মাংস। কেএমসি-র কলকাতা পুরসভার আধিকারিকরাও অভিযান চালাচ্ছেন। দুধ, ঠাণ্ডা পানীয়, তেলের কোয়ালিটি, সব কিছুই পরীক্ষার আওতায় আসছে। বনগাঁর এক মিষ্টির কারখানায় ইঁদুররা বেশ সপরিবারে বসবাস করছে। বহরমপুরে কয়েকটা রেস্টুরেন্টে বন্ধের নোটিশ ধরানো হয়েছে। ম্যানেজার-সহ দু'জন গ্রেপ্তার হয়েছে। তারা সরকারি নির্দেশ অমান্য করে রেস্টুরেন্ট আবার খুলেছিল।

দুর্গাপুরে রেস্টুরেন্টে পাওয়া গেল দুর্গন্ধযুক্ত মোমো, সস পচে গেছে। বহু জায়গায় ফুড সেফটি লাইন্সেস নেই, এতদিন কোনো সমস্যা তাদের ছিল না। এখন তাদের স্টক থেকে কিলো কিলো পচা মাছ মাংস বেরোচ্ছে, যেগুলি ফেলে দেওয়া হচ্ছে। গড়িয়াহাট মার্কেটের মতো সম্ভ্রান্ত লোকজনদের প্রিয় বাজার থেকে কয়েকশো কিলো দুর্গন্ধযুক্ত পচা মাংসের সন্ধান পাওয়া গেছে, এখন এই বাজারকে বলা হচ্ছে পচা মাংসের খনি।

পার্কস্ট্রিট অঞ্চলের বেশ কয়েকটি হোটেল বন্ধ করে দিয়েছে কেএমসি, যেমন হোটেল করিমস্ যেটা মীর্জা গালিব স্ট্রিটে অবস্থিত, এখানকার খাবার অত্যন্ত নিম্নমানের। আছে আরসালান, ডন জিওভানী, বি.এল. সাহা রোডের বলরাম মল্লিক-রাধারমণ মল্লিকের দোকান। নামকরা কয়েকটি শপিংমলের রেস্টুরেন্টেও হানা দেওয়া হয়েছে, এর মধ্যে আছে কসবার অ্যাক্রোপোলিস মল, যেখানে কেএমসি-র অফিসাররা নিম্নমানের, মেয়াদ উত্তীর্ণ মশলাপাতি, পচা খাবারের সন্ধান পেয়েছেন।

এখনো পর্যন্ত চল্লিশটা রেস্টুরেন্ট ও খাবারের দোকানকে বন্ধ করা হয়েছে। এদের ফুড লাইন্সেস বাতিল করা হয়েছে। এগুলি শহর কলকাতার ছবি। কলকাতা পুরসভার প্রশাসক স্মিতা পাণ্ডে জানিয়েছেন, 'মানুষের স্বাস্থ্যের সঙ্গে কোনো আপোশ নয়।' খোলা বাজারে রেইড চালানো হচ্ছে।

দীর্ঘদিন ধরে এই অসাধু ব্যবসায়ীরা সাধারণ মানুষকে বিষ পরিবেশন করে আসছে। পূর্বতন সরকার কিছুই করেনি। কেউ শাস্তি পায়নি, এদের কারবার রমরম করে চলেছে এতদিন ধরে। এই সব কুখাদ্য খেয়ে নানা ধরনের শারীরিক ব্যাধি হয়ে থাকে। বৃহদন্ত্রের ভালো ব্যাকটেরিয়াগুলি নষ্ট হয়ে যায়, জানিয়েছেন পুষ্টিবিদ ডাঃ পবিত্র খাঁ। পাকস্থলীর প্রভূত ক্ষতি হয়। লিভার, কিডনি ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। জমিয়ে রাখা, পচাগলা মিষ্টি, ভেজাল রং দেওয়া, ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহৃত হওয়ায় নানা রোগের কবলে পড়ছে মানুষ। মোগলাই পরোটা, কচুরী, পকোড়া, চপ, আরও নানা ধরনের খাদ্য কোন্ তেলে ভাজা হচ্ছে, কেউ জানতো কি? এখন তো অল্প বয়সি ছেলে-মেয়েদেরও হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে, ইনফার্টিলিটির রোগ বেড়ে গেছে। বহু জায়গায় হানা দিয়ে অধিকারিকরা দেখছেন অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে রান্না হচ্ছে। নোংরা কড়াইতে পোড়া, কালো হয়ে যাওয়া তেলে মাংস কষানো হচ্ছে, মাছ ভাজা হচ্ছে। মানুষ রসনাতৃপ্তির জন্য খাচ্ছে, আর অ্যাসিডিটি, গ্যাসট্রাইটিস, আলসার, এমনকী কোলন ক্যানসারের মতো মারণ রোগের শিকার হচ্ছে।

বর্তমান সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর এই খাদ্য-সুরক্ষা অভিযান উদ্যোগকে সবাই সাধুবাদ জানাচ্ছেন। আশা করা যায় সরকারি আধিকারিকরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবেন। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি মিষ্টির দোকানের শোকেসে সাজানো মিষ্টির রং শুধুই সাদা, রঙিন মিষ্টি উধাও। প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসুর সুপুত্রের সল্টলেকের হোটেলেও খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের অভিযান চলে এবং সেখানেও একই দৃশ্য কিচেনে ও ফ্রিজে। দেখা যাচ্ছে, ভি ভি আই পিরাও সরকারের জালে ধরা পড়ছেন। আরও পড়বে। নতুন সরকারের এই উদ্যোগ সম্পূর্ণ ভাবে সাফল্য লাভ করবে, সাধারণ মানুষের এটাই আশা। □

শোকসংবাদ



কোচবিহার শহরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক হরিপদ পাল গত ১৯ অক্টোবর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর। পূর্ববঙ্গের খুলনা জেলার বাগেরহাটে তাঁর জন্ম। মালদা শহরে বিটি পড়ার সময় সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক হন। ব্যক্তিগত জীবনে উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। কোচবিহার জেলার বিজেপির সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ২ পুত্র, ২ পুত্রবধূ ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *



মালদা জেলার কালিয়াচক শাখার স্বয়ংসেবক অমিয়াংশু গুপ্ত গত ২৪ অক্টোবর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী ও ১ পুত্র রেখে গেছেন।

* * *



রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মধ্যবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডলের মাতৃদেবী আরতি রানী মণ্ডল গত ১৬ অক্টোবর বর্ধমান জেলার পালশিট গ্রামের বাড়িতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। তিনি ২ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *



বসিরহাট জেলার প্রবীণ স্বয়ংসেবক সুভাষচন্দ্র নাথ গত ২৬ অক্টোবর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। তিনি উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বৌদ্ধিক প্রমুখ-সহ বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন।

একমাত্র লক্ষ্য হোক ‘বিকশিত ভারত-২০৪৭’

সুজিত রায়

দিল্লির পথঘাট এখন যেন নিরাপদ নয়। গোটা শহরের জনাকীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে প্রতিদিন সাতসকালে বাসা বাঁধছে আরশোলারা। অতীতে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে আরশোলা, পিঁপড়ে, ছারপোকা, তেলাপোকা, টিকটিকি, ম্যাগটদের অনুপ্রবেশ কখনোও দেখা যায়নি। স্বাধীনতা প্রাপ্তির আশি বছরের মাথায় যখন ভারতবর্ষের সনাতনী ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, সামাজিক মূল্যবোধ এবং রাজনীতির রাজধর্ম ফিরিয়ে আনার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার এগোচ্ছে সার্বিক উন্নয়নের সঙ্গে, যখন দীনদয়াল উপাধ্যায়ের মতো দেশ মনীষার ‘একাত্ম মানবদর্শন’-এর নির্যাসে সিক্ত হয়ে উঠছে ‘বিকশিত ভারত’ প্রকল্পের এক একটি উন্নয়নমুখী সিঁড়ি, ঠিক তখনই এক চরম আতঙ্কে হারতে হারতে প্রায় তলিয়ে যাওয়া বিরোধী দলগুলি নতুন নতুন মুখোশ পরে নতুন জনাতঙ্ক সৃষ্টির প্রলয়নৃত্য শুরু করেছে রাজধানীর রাজপথে। একদা ঠিক এইভাবেই আগুন নিয়ে খেলতে নেমেছিল আম আদমি পার্টি।

একচ্ছত্র নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়ালের মুখোশ খুলে যাওয়ার পর এখন তাঁরই তৈরি নতুন প্রজন্মের আপ— আরশোলার রূপ পরিগ্রহ করে ধান্দা গোছাতে ময়দানে নেমে পড়েছে। আর কংগ্রেস বা সিপিআইএমের মতো প্রায় দেউলিয়া রাজনৈতিক দলগুলি ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমেছে অস্তিত্ব বজায় রাখার মহান ব্রত অবলম্বন করে। অ্যাজেন্ডা হলো মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে হঠানো। কারণ তিনি ‘ভোটচুরি’ রুখে দিয়ে বিরোধীদের চরম সর্বনাশ করে দিয়েছেন।

মৃত ভোটার, জাল ভোটার, দ্বৈত ভোটার, অনাগরিক ভোটার, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ভোটারদের ‘ভোটব্যাংক’ রাতারাতি উধাও হয়ে যাওয়ায় তাদের নাভিশ্বাস উঠে গেছে। তাই এই একমাত্র অ্যাজেন্ডাকে আঁকড়ে ধরে তীরে ওঠার দুর্ভার প্রয়াসে তারা আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু করে তুলেছে সেই নরেন্দ্র মোদীকে যিনি গত ২৫ বছর ধরে প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে প্রথমে গুজরাট, তারপর গোটা দেশে উন্নয়নের নিত্য নব দিশা প্রদর্শন করছেন।

সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ যারা আছেন যেকোনো রাজনৈতিক মতাদর্শের, তাঁদের কাছে এই প্রবন্ধে কিছু সংখ্যাতত্ত্বভিত্তিক তথ্য পরিবেশন করব। তাঁদের কাছে জানতে চাইব, এর আগে ১৯৪৭ থেকে ২০১৩ এই দীর্ঘ প্রশাসনিক যাত্রাপথে কোনো প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন কোনো সরকার কি এই বিশাল উন্নয়ন যজ্ঞের ইতিহাস রচনা করেছেন? আর জানতে চাইব— সব পড়ার পর, সব বোঝার পর, আরশোলা হোক বা আইসা হোক, চিমসে দীপকে কিংবা বোরা (বস্তা) বা বরা (বরাহ) হোক, তাদের রাজপথে নগ্ন শরীর প্রদর্শনের দেশোদ্ধারের বিপ্লবকে আর সহ্য করবেন কিনা এবং যদি মনে করেন, এই বিক্ষোভ কেবলই একটি সুশৃঙ্খল সমাজকে উত্যক্ত করার নিন্দনীয় প্রচেষ্টা, তাহলে জানাবেন, এদের উৎখাত করতে কোন সনাতনী ওষধির প্রয়োগ প্রয়োজন।

আসুন, এক এক করে আসি উন্নয়নের প্রসঙ্গগুলিতে। প্রথমেই আসি বেসিক ম্যাট্রিক্সগুলিতে যেগুলি মূলত উন্নয়নের সূচককে প্রতিষ্ঠিত করে। এই তথ্য এখানে পরিবেশিত হচ্ছে তুলনামূলক বিচারে— ‘মা কী ছিলেন, কী হইয়াছেন’-এর মতো ২০১৪ সালে দেশের অবস্থাটা কী ছিল আর ২০২৬ সালে ভারত ঠিক কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। মনে রাখা দরকার, ২০১৪ সালের ১১ মে ছিল সেই ঐতিহাসিক দিন যেদিন সমস্ত বিরোধী দলের সংখ্যালঘু তোষণের রাজনীতি তথা ভোটব্যাংকের মুখে ঝামা ঘষে দিয়ে নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী প্রথম সম্পূর্ণ ভারতীয় সরকার গঠন করেছিলেন যে সরকারের মজ্জায় মজ্জায় ছিল ভারতের মূল জীবনশৈলী, মূল যাপনশিরা এবং আগামী ভবিষ্যতে একটি সম্পূর্ণ রাষ্ট্র ভাবনায় জাগ্রত সমাজ গঠনের লক্ষ্য। আসুন দেখা যাক।

উন্নয়নের মূল সূচক	২০১৪	২০২৫
মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জিডিপি)	০.২০ট্রিলিয়ন ডলার	৪.৩ ট্রিলিয়ন ডলার
আন্তর্জাতিক স্থান (র‍্যাঙ্ক)	দশম	চতুর্থ
শতাংশের হিসেবে জিডিপি	৭.৫ শতাংশ	৮.২ শতাংশ
মাথাপিছু আয়	১,৪৩৮ ডলার	২,৮৮০ ডলার
পরিকাঠামোর উন্নয়ন		
জাতীয় হাইওয়ে ও এক্সপ্রেসওয়ে	৯১,২৮৭ কিমি	১,৪৬,০০০ কিমি
রেলপথের বিদ্যুতায়ন	গত ১২ বছরে	বৃদ্ধি ৯৬ শতাংশ
সৌর শক্তি	২.৬ গিগাওয়াট	১৬২ গিগাওয়াট
গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন	১.০৪ লক্ষ গ্রাম	১৮,৩৭৪ গ্রাম নতুনভাবে সংযুক্ত
ডিজিটাল অর্থনীতি		
ডিজিটাল অর্থনৈতিক আদানপ্রদান (ইউপিআই)	০ বিলিয়ন	১৮৫ বিলিয়ন
আধার-যুক্ত সরাসরি আর্থিক ভাতা প্রদান	—	—
বাণিজ্য ও বৈদেশিক মুদ্রার সংরক্ষণ		
বৈদেশিক মুদ্রার সংরক্ষণ	৩০২ বিলিয়ন ডলার	৩৮৭ বিলিয়ন ডলার
গড় মূল্যবৃদ্ধি	৯.৪ শতাংশ	৫ শতাংশ
দারিদ্র্য সূচক	২১.৯ শতাংশ	৫.৩ শতাংশ
মেট্রো রেল	২৪৮ কিমি	১০০ শতাংশ
ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ	৬৭.৬ শতাংশ	১০০ শতাংশ
প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম রপ্তানি	১.৬ বিলিয়ন ডলার	২৩.৬ বিলিয়ন ডলার

ফঃ ২

স্বীকৃত স্টার্ট আপ	১১০০০+	১,৫৯,০০০+
উন্নয়ন গতির হার	৬.৩ শতাংশ	৬.৮ শতাংশ
ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট		১০৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার মোট বৃদ্ধি ২৭%
সমাজ কল্যাণ		
সামাজিক সুরক্ষা খাতে উপকৃতের সংখ্যা	১৯%	৬৪.৩%
শিক্ষিতের হার	৭৪.৪%	৮১%
মহিলা স্বাক্ষরতার হার	—	৭৭.৭%

● **স্যানিটেশন :** মোট উপকৃতের সংখ্যা ২২.৬৮ কোটি পরিবার।

● **রেশন প্রদান :** ডিজিটাল সংযোগে উপকৃতের সংখ্যা ৮১ কোটিরও বেশি মানুষ।

● **মহিলাদের স্বনির্ভর প্রকল্প :** ১০.৫ কোটি মহিলা। কয়েক মিলিয়ন মহিলা লাখপতি হয়েছেন।

● **নলবাহিত পানীয় জল :** উপকৃত পরিবারের সংখ্যা ১৫.৮৪ কোটি।

● **বিনামূল্যে গ্যাস সংযোগ :** উপকৃতের সংখ্যা ১০.৫৭ কোটি মহিলা।

● **স্বাস্থ্যবিমা :** আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে উপকৃতের সংখ্যা ৪৩.৯৩ কোটি।

● **স্কুলছাড়ের হার :** ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল ছাড়ের হার ৪.৬ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে ০.৩ শতাংশ।

● **শিল্প :** সামগ্রিকভাবে বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬৬৪ বিলিয়ন ডলারে।

ইলেক্ট্রনিক ও মোবাইল শিল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ হয়েছে ৫.৪৫ লক্ষ কোটি টাকা। ইলেক্ট্রনিক সামগ্রীর রপ্তানির পরিমাণ বেড়েছে ৪ গুণ।

ভারী শিল্প ইস্পাত ও সিমেন্ট ক্ষেত্রে ভারত এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎপাদক।

বর্তমানে কয়লা উত্তোলনের পরিমাণ ছুঁয়েছে ১,০৪৭ মিলিয়ন টন। ১২ শতাংশ বৃদ্ধির হার।

প্রতিরক্ষা শিল্পে রপ্তানির পরিমাণ বেড়েছে ২১ গুণ।

সামগ্রিকভাবে গত বারো বছরে এই উন্নয়ন অন্তত একটা সত্য প্রতিষ্ঠা করে যে দেশ একোচ্ছে 'বিকশিত ভারত' হয়ে ওঠার লক্ষ্যে। অস্বীকার করে উপায় নেই, অতীতের কোন কেন্দ্রীয় সরকার এই উন্নয়নের স্বাক্ষর রাখতে পেরেছিল, একমাত্র নরসীমা রাও সরকার ছাড়া। একথাও মেনে নিতে হবে রাজীব গান্ধীই প্রথম ইলেক্ট্রনিক কমিউনিকেশনের বৃদ্ধির ওপর জোর দিয়েছিলেন। কিন্তু নরসীমা রাও কিংবা রাজীব গান্ধী সামান্য ব্যতিক্রমী নিদর্শন মাত্র। সামগ্রিকভাবে নরেন্দ্র মোদীর কার্যকর উন্নয়নের তুলনামূলক আলোচনায় তা ছিল নিমিত্ত মাত্র। মোদীজীর এই সাফল্যের পিছনে রয়েছে ২০৪৭ পর্যন্ত বিস্তৃত এক দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা। এবং সেই পরিকল্পনা বিচ্ছিন্নভাবে বিষয়ভিত্তিক উন্নয়ন নয়। সামগ্রিকভাবে উন্নয়নের একটি বৃহত্তর জলছবি। অনেকটাই পেরেছেন।

কিন্তু যেটা এখনো করে উঠতে পারেননি তা হলো বেকারত্ব দূরীকরণ। গত ৬ মাসের হিসেব অনুযায়ী ভারতব্যাপী বেকারত্বের হার ৫.১ শতাংশ থেকে ৫.৪ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। এটা সামগ্রিক উন্নয়নের নিরিখে নিঃসন্দেহে খুবই হতাশাব্যঞ্জক একটি চিত্র। সরকারি তথ্য অনুযায়ী গ্রামীণ বেকারত্বের হার বেড়েছে .০৪ শতাংশ। শহরে এই বৃদ্ধির হার .০১ শতাংশ। জনমজুরের সংখ্যা, শ্রমিক সংখ্যা ক্রমাগত হ্রাস পাশে। অথচ ভারতবর্ষে যুবশক্তির (১৫-২৯ বছর) হার ২৭ শতাংশ। সংখ্যার বিচারে তা হলো ৩৮২ মিলিয়ন। এই বিশাল যুবশক্তি যদি বছরের পর বছর কর্মহীন হয়ে থাকে, তাতে গোটা দেশ অতি দ্রুত প্রাণশক্তি হারাবে। বিশাল ক্ষতি হয়ে যাবে ভারতবর্ষের।

যদিও বিশেষজ্ঞরা বলছেন— এর পিছনে রয়েছে অনেকগুলি বাস্তবসম্মত কারণ। যেমন— (ক) অধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, (খ) শিক্ষাগত যোগ্যতা ও শিল্প ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যোগ্যতার অমিল, (গ) কৃষি নির্ভরতা ও মৌসুমী বেকারত্ব, (ঘ) শিল্পায়নে ধীরগতি এবং পুঁজি নির্ভর উৎপাদন, (ঙ) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের অবক্ষয়, (চ) বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব, (ছ) শ্রমবাজারে কম সংখ্যক নারীর অংশগ্রহণ। কারণগুলি যৌক্তিক কিন্তু পেটের খিদে আরও অনেক বেশি যৌক্তিক।

মূলত এই একটি ক্ষেত্র ছাড়া বাকি ক্ষেত্রে ভারত সরকার সুশাসনের পরিচয়ই রেখে চলেছে। ২০১৪ সালে মোদীজীর নেতৃত্বে সরকার গঠনের পর উন্নয়নের প্রদীপ জ্বলা শুরু হয়েছিল 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান' প্রকল্পের মাধ্যমে। সরকারি হিসেবে সেই সময় থেকে গত বারো বছরে ১২.১৪ কোটি পারিবারিক শৌচাগার, ২.৭৬ লক্ষ কমিউনিটি স্যানিটারি কমপ্লেক্স তৈরি হয়েছে। ওডিএফ প্লাস গ্রাম হিসেবে ঘোষিত হয়েছে ৫.৬৯ লক্ষ গ্রাম। সংখ্যার চাইতে এই প্রকল্পগুলির সামাজিক তাৎপর্য অনেক গুণ বেশি।

ঠিক যেমনটি হয়েছে 'সৌভাগ্য' প্রকল্পের ক্ষেত্রে। ২০১৭ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে ২.৮৬ কোটি পরিবারকে বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়ে একটি সর্বকালীন রেকর্ড স্থাপন করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। গ্রামীণ আবাস যোজনায় ২০২৬ সালে আগস্ট পর্যন্ত অনুমোদিত ৩.৯১ কোটি বাড়ির মধ্যে ৩.১৬ কোটি বাড়ি সম্পূর্ণ হয়েছে। নলবাহিত পানীয় জল পাচ্ছেন ৮১.৭১ শতাংশ মানুষ। নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন গ্রামীণ মহিলা সমাজ যাদের প্রতিদিনের কাজ ছিল মাইলের পর মাইল হেঁটে, নদী বা কুয়ো থেকে জল সংগ্রহ করে বাড়িতে আসা। সামগ্রিকভাবে নগরমুখী উন্নয়নের আরও একটি বড়ো নজির 'জনধন যোজনা'। যা কোটি কোটি মানুষকে আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার আওতাধীন করে মানুষের জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যকে ফিরিয়ে দিয়েছে। এপর্যন্ত আলোচিত এই সমস্ত প্রকল্পগুলিতে একটি সত্যই ধরা পড়ে, তা হলো নরেন্দ্র মোদীজীর জনকল্যাণ ভাবনা। অর্থাৎ 'উন্নয়ন' মানে আজ শুধু মাথাপিছু আয়ের হিসেব বা অভ্যন্তরীণ উন্নয়নের হিসবেই নয়— মানুষের জীবনযাত্রা কোন প্রকল্পের মাধ্যমে

কতখানি সহজ হয়ে উঠল সেই হিসেবটাই আসল উন্নয়নের ছবি হয়ে ধরা দেয়।

এই ভাবনার অত্যন্ত বড়ো প্রমাণ উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা যা মূলত অর্থনৈতিক গতিরই বাহন হয়ে ওঠে। ২০১৪ সালে মোদীজী যখন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সংসদ ভবনের চৌকাঠ ছুঁয়ে বলেছিলেন— একমাত্র ভারতই পারে একটি দরিদ্র পরিবারের সন্তানকে দেশের প্রধানমন্ত্রী পদে বরণ করে নিতে, তখনও তাঁর চোখে নিশ্চয়ই ভেসে উঠেছিল দুর্গম রাস্তাঘাট, পরিবহণ ব্যবস্থার আকাল চিত্র। তাই ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর তাঁর অন্যতম লক্ষ্য ছিল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন। ২০১৪ সালের হিসেব অনুযায়ী তখন জাতীয় সড়কের দৈর্ঘ্য ছিল ৯১,২৮৭ কিলোমিটার। মোদীজীর ভাবনা সেই দৈর্ঘ্যকে ২০২৬-এ এনে দাঁড় করিয়েছে ১,৪৬,৫৭৬ কিলোমিটারে। ২০১৪ সালে উচ্চগতির করিডোর ও এক্সপ্রেস ওয়ের দৈর্ঘ্য ছিল মাত্র ৯৩ কিলোমিটার। বর্তমানে তা ৩০৫২ কিলোমিটার। এই সড়ক যোজনা গোটা দেশের অর্থনীতি বদলে দিয়েছে। চাষীর আকালদুর্দশা কমেছে অনেকটাই। ফসল ফলছে যেমন দ্বিগুণ হারে, বাজারে পৌঁছাচ্ছে তাও দ্বিগুণ গতিতে।

গ্রামীণ অর্থনীতি মজবুত ও দৃঢ় হচ্ছে প্রতিদিন। কিন্তু এখানেই থমকে দাঁড়াচ্ছে না পরিবহণের আধুনিক উন্নয়ন ব্যবস্থা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে গৃহীত হয়েছে 'প্রধানমন্ত্রী গতিশক্তি জাতীয় মহাপরিকল্পনা।' পরিকল্পনাটি ভাবা হয়েছিল ২০২১ সালে সেই করোনা আক্রান্ত ভারতবর্ষের মাটিতে দাঁড়িয়েই। লক্ষ্য ছিল— ভূতল পরিবহণ, রেলওয়ে, বিমানবন্দর, সমুদ্র ও নদী বন্দর, গণপরিবহণ ও পণ্যপরিবহণ কাঠামোকে একটি সর্ব সমন্বিত প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে আসা। এই ব্যবস্থার আওতাভুক্ত করা হয়েছিল ৪৪টি কেন্দ্রীয় মন্ত্রক ও ৩৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে। উদ্দেশ্য ছিল শুধু রাস্তা তৈরি করাটাই নয়, প্রতিটি পরিবহণ ব্যবস্থার সঙ্গে একটি সমন্বিত যোগাযোগ স্থাপন করা, যাতে প্রতিটি পরিবহণ ব্যবস্থা প্রতিটির যাবতীয় সুযোগ সুবিধা লাভ করতে পারে। তাই 'গতিশক্তি' পরিকল্পনার পাশাপাশিই ২০২২ সালে চালু হয় জাতীয় লজিস্টিক নীতি। এই নীতি পরিষেবা উন্নয়নে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে দিয়েছে যা ভারতীয় অর্থনীতিকে সুগম করে তুলেছে। একদিকে পণ্য পরিবহণ প্রতিযোগিতার সুফল যেমন মিলেছে, তেমনি লজিস্টিক খাতে ব্যয় প্রায় ১৩ শতাংশ কমিয়ে আনার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে।

মোদীজী এই প্রকল্পের হাতেখড়ি নিয়েছিলেন গুজরাটে— সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময়। সেই ২০০১ সালে। এখন তা ডিজিটাল সক্রিয়তায় আরও বিশাল সুবিধা জুগিয়ে 'বিকশিত ভারত— ২০৪৭' নামক দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অন্যতম সূচক হয়ে উঠছে।

'বিকশিত ভারত ২০৪৭' হলো একটি ভিশান বা দূরদৃষ্টি। সার্বিক উন্নয়নের একটি সুচিন্তিত লক্ষ্য। কায়িক শ্রম শুধু নয়, শিল্প মানে এখন উচ্চ প্রযুক্তির সমাবেশ— সেমিকন্ডাক্টর থেকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার একটি সমন্বিত প্রক্রিয়া। আধুনিক অর্থনীতিতে বিশ্ব জুড়েই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হয়ে উঠছে উৎপাদনশীলতার নতুন চালিকাশক্তি। কিন্তু দেড়শো কোটি মানুষের ভারতবর্ষকে প্রধানমন্ত্রী সম্পূর্ণভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারকারী দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে চান না। বহু শিল্পে যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিশেষভাবে ফলদায়ক সেই সব ক্ষেত্রে এ আই ব্যবহার হচ্ছে ও হবেও। কিন্তু পাশাপাশি দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার জন্য গবেষণা ভিত্তিক শ্রমিকরাও থেমে থাকবে না। সেখানে মিশে থাকবে পরিবেশ-বান্ধব শক্তি উৎপাদনের প্রচেষ্টাও। কারণ প্রাকৃতিক জ্বালানি একদিন না একদিন শেষ হবেই। কিন্তু সূর্য রাতারাতি নিভে যাবে না।

তাই সোলার শক্তির পাশাপাশি বায়ুশক্তি, গ্রিন হাইড্রোজেন, ব্যাটারি সংরক্ষণ, বৈদ্যুতিন গাড়ি ইত্যাদির মাধ্যমে শক্তি- নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে জোরদার করে তেল ও গ্যাসের যে আন্তর্জাতিক রাজনীতি তাকে সামাল দেওয়াই হলো মূল লক্ষ্য। আরও লক্ষ্য কর্মসংস্থানে মানোন্নয়ন, তরুণ জনশক্তির দক্ষতা বাড়াতে পুনর্মূল্যায়ন এবং উচ্চতর উৎপাদনশীল অর্থনীতি গড়ে তোলা।

আসল কথা হলো— 'উন্নয়ন' শুধুমাত্র একটি একক নয়। উন্নয়নের অর্থ হলো বহুমাত্রিকতা। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রচেষ্টা, শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির অগ্রগামী অবদান, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে রাজনীতি ভুলে হাতে হাত ধরে এগিয়ে চলার ব্রতের মধ্যেই নিহিত রয়েছে 'বিকশিত ভারত— ২০৪৭'-এর লক্ষ্যে পৌঁছানোর নির্যাস। একটি সুগঠিত সরকারের ভিত্তি দীর্ঘমেয়াদি হতে পারে সামগ্রিক ভাবে মানুষের সশক্তিকরণের মধ্যে। বিরোধী দলগুলিকে মাথায় রাখতে হবে— শুধু জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের ভোট ব্যাংক গড়ে তোলার স্বার্থে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সমস্যাগুলিকে আতসকাচে বৃহত্তরভাবে না দেখে, কথায় কথায় আন্দোলনের ঝাঁঝ বাড়িয়ে সরকার এবং নাগরিককে উত্যক্ত করে দেশজুড়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলে দেশ এগোবে না। প্রতিবেশী দেশগুলি যখন কামান দাগার জন্য বসেই আছে, তখন বিরোধী দলগুলি যারা নিজস্ব রাজনৈতিক শক্তি হারাতে হারাতে প্রায় শূন্যে এসে পৌঁছেছে, তারাও সেই কামানের আক্রমণ থেকে রেহাই পাবে না। সংকীর্ণ স্বার্থে আজ তারা ককরোচ পার্টি, আইসার মতো যেসব সাময়িক উন্মাদনা সৃষ্টিকারী দলগুলিকে তৈরি করে মাঠে নামাচ্ছে, মনে রাখতে হবে, এরাই একদিন ফ্যাঙ্কেনস্টাইন হয়ে উঠবে এবং ক্ষমতার লোভে তাদের মালিকদের গলা টিপে মারবে। ইতিহাসে বার বার সেটাই প্রমাণিত হয়েছে।

দেশ কোনো সরকারের পৈতৃক সম্পত্তি নয়। দেশ মানুষের। দেশ নাগরিকের। দেশ কোনো রাজনৈতিক দলের নয়। কোনো বিদেশি শক্তির মদতপুষ্ট অভ্যন্তরীণ শক্তিশিবিরেরও নয়। দেশ মানুষের। দেশ আমার-আপনার সবার।

কেন্দ্রীয় সরকার গত বারো বছর ধরে যে ভাবনাচিন্তা নিয়ে এগোচ্ছে— তাকে বাস্তবায়িত করা শুধু সরকারের কাজ হতে পারে না। এ কাজ আমাদের সকলের। বিচ্ছিন্নতার বিষ ছড়ানো নয়, সামগ্রিকতার আবাহনই হোক আজকের দিনের মন্ত্র। আমাদের এক এবং একমাত্র লক্ষ্য 'বিকশিত ভারত— ২০৪৭'। এই লক্ষ্যে পৌঁছনোই হোক ভারতবাসীর একমাত্র মহান ব্রত। □

এক জেহাদির ৯/১১-র পরিকল্পনা ব্যর্থ করলেন হিন্দু পাইলট স্মিত মচ্ছর

মণীন্দ্রনাথ সাহা

৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দুবাই থেকে ইজরায়েলের তেল আভিভগামী ফ্লাই দুবাই এফ জেড ১০৭৩ (FZ 1073) ফ্লাইটটি ধ্বংস করে দেওয়ার ভয়াবহ চেষ্টা চালানো হয়। সেই বোয়িং ৭৩৭ ম্যাক্স ৮ বিমানটিতে ক্রু ও যাত্রী মিলিয়ে ১৮০ জন ছিলেন, যাঁদের অধিকাংশই ইজরায়েলি নাগরিক।

জানা গিয়েছে বিমানটি ওড়ার মাঝপথে জর্ডনের আকাশসীমায় প্রায় ৩৪ হাজার ফুট উঁচুতে ছিল। তখন ওমানের মুসলমান নাগরিক কো-পাইলট, আচমকা মূল পাইলটের ওপর ছুরি নিয়ে চড়াও হন। মূল পাইলট ভারতীয় নাগরিক ক্যাপটেন স্মিত মচ্ছর গুরুতর আহত হন। সেই সময় বিমানটি মাত্র ২ মিনিটে আচমকা প্রায় ১৭,৪০০ ফুট নীচে নেমে যায়। যার ফলে যাত্রীদের মধ্যে চরম আতঙ্ক ও হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে বিমান থেকে প্রথমে জরুরি হাইজ্যাক সংকেত ৭৭০০ পাঠানো হয়। এর কয়েক সেকেন্ড পর পুনরায় ৭৫০০ সংকেত পাঠানো হলে ইজরায়েল তাৎক্ষণিকভাবে যুদ্ধবিমান মোতায়েন করে।

সেই সময় ক্যাপ্টেন স্মিত মচ্ছর মারাত্মক আহত হওয়া সত্ত্বেও নিজের শেষ শক্তি দিয়ে ককপিটের দরজার আনলক বা রিলিজ বাটনটি টিপে দেন। ক্যাপ্টেন দরজা আনলক করে দেওয়ার পর বাইরে অপেক্ষারত কেবিন ক্রু এবং সাধারণ যাত্রীরা দ্রুত ককপিটে প্রবেশ করেন। তাঁরা হামলাকারী কো-পাইলটকে জাপটে ধরে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন এবং বিমানটিকে ভয়ানক বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেন। পরে বিমানে যাত্রী হিসেবে থাকা অফ-ডিউটি অন্য দুই পাইলট বিমানটি সৌদি আরবের তাবুকে নিরাপদে অবতরণ করান। সেখানে সৌদি কর্তৃপক্ষ হামলাকারীকে গ্রেপ্তার করে এবং আহত ভারতীয় পাইলটকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইজরায়েল কাট্‌জ এই ঘটনাকে একটি 'জেহাদি সন্ত্রাসবাদী হামলা' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মতে, হামলাকারী কো-পাইলটের উদ্দেশ্য ছিল ৯/১১-র কায়দায় বিমানটিকে কোনোভাবে আছড়ে ফেলে ধ্বংস করে সমস্ত যাত্রীকে হত্যা করা। এই ঘটনার পর ফ্লাইদুবাই কর্তৃপক্ষ তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত ইজরায়েলে তাদের সমস্ত ফ্লাইট সাময়িকভাবে স্থগিত রেখেছে।

ইজরায়েলের সংবাদমাধ্যমও পাইলটের ভারতীয় পরিচয়ের কথা জানিয়েছে। একটি সংবাদমাধ্যম তাঁকে 'ভারতীয় বংশোদ্ভুত' পাইলট হিসেবে উল্লেখ করেছে। অন্য একটি প্রতিবেদনে তাঁকে ভারতীয় নাগরিক বলা হয়েছে। আবার ইজরায়েলের জাতীয় নিরাপত্তামন্ত্রী ইতামার বেন-গভির দাবি করেছেন, 'অভিযুক্ত পাইলট বিমানটি ভেঙে ফেলার ষড়যন্ত্র করেছিলেন এবং বিমানে থাকা ইজরায়েলি যাত্রীদের হত্যার পরিকল্পনা ছিল। এছাড়া এক সাক্ষাৎকারে নেতানিয়াহু বলেছেন, 'আকাশপথে ভয়াবহ বিপদের মুহূর্তে অসীম সাহসিকতার পরিচয় দেওয়া ভারতীয় পাইলট ৯/১১-র মতো একটি বিপর্যয় ঠেকাতে সক্ষম হয়েছেন।' শুধু নেতানিয়াহু নন, তাঁর সাহসিকতার জন্য স্মিতকে 'নায়ক' বলে অভিহিত করেছেন ইজরায়েলিরা। সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে একাধিক ভিডিয়ো। অনেকেই বলেছেন, 'এই নামটা মনে রাখুন।'

ভারতীয় পাইলট ক্যাপ্টেন স্মিত মচ্ছরের সাহসিকতার জন্য বিশেষ সম্মান দেওয়ার ঘোষণা করেছে গুজরাট সরকার। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল তাঁকে 'বিশিষ্ট গুজরাট গরিমা' পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা করে বলেছেন— 'সংকটের মুহূর্তে স্মিত যে সাহস ও মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, তা গুজরাটের মানুষের কাছে গর্বের বিষয়।' আরও জানা গিয়েছে, সহ-পাইলটের ছুরি হামলায় গুরুতর আহত হয়েও বিমানটিকে বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করায় স্মিত মচ্ছরকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প 'নায়ক' বলেও অভিহিত করেছেন।

ভারতীয় পাইলট স্মিত মচ্ছরের সঙ্গে ফোনে কথা বলে তার সাহসিকতার প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভিডিয়ো বার্তায় পাইলটের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেওয়ার পাশাপাশি তাঁর প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'স্মিতের জন্য গোটা দেশ গর্বিত।'

ঘটনায় অভিযুক্ত ওমানের নাগরিক পাইলটকে মজহবি উগ্রপন্থী বলে দাবি করেছেন তাঁর এক সহকর্মী। ইজরায়েলের সংবাদমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ওই পাইলট দাবি করেছেন, অভিযুক্ত ব্যক্তি মাত্র আটমাস আগে ফ্লাই দুবাইয়ে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর আচরণ নিয়েও সহকর্মীদের মধ্যে প্রশ্ন ছিল। অভিযুক্ত পাইলট কীভাবে ইজরায়েলগামী বিমানে দায়িত্ব পেল, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। কারণ ওমানের সঙ্গে ইজরায়েলের কুটনৈতিক সম্পর্ক নেই। বিষয় তদন্তকারীদের নজরেও রয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

আজ যখন ভারতবাসী হিসেবে আমরা এবং সমগ্র বিশ্ববাসী ক্যাপ্টেন স্মিতের বীরত্ব, সাহসকে বাহবা দিচ্ছি, তখন কংগ্রেস, সিপিএম-সহ বিজেপি প্রতিপক্ষ দলগুলো চুপ। এদের এই চুপথাকা প্রমাণ করে এরাও হয়তো মনেপ্রাণে চেয়েছিল আরও একটা ৯/১১-র মতো ঘটনা ঘটুক। ভোটব্যাংককে খুশি করতে এরাই ওই ঘাতক পাইলটের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে বলে অনেকেই মনে করেন। এমনকী এদের সঙ্গে তথাকথিত বুদ্ধিজীবী মহলও নীরব। □

এক মহাজীবনের নাম ‘ভগিনী নিবেদিতা’



সৈকত নিয়োগী

ভগিনী নিবেদিতার নাম উচ্চারণ করলেই আমাদের মনে যে ছবিটি ভেসে ওঠে, তা মূলত এক বিদেশিনী সন্ন্যাসিনীর— স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা, বাগবাজারের সরু গলিতে মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় গড়ে তোলা এক নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষিকা, প্লেগ মহামারীর সময় কলকাতার মানুষের পাশে দাঁড়ানো এক সাহসী নারী। কিন্তু এই পরিচয়ের আড়ালে যে নিবেদিতা ছিলেন, তাঁকে জানার জন্য আমাদের ইতিহাসের আর-একটি দরজা খুলতে হয়। সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেই দেখা যায়, তিনি শুধু একজন সমাজসেবিকা ছিলেন না— ভারতের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ এবং স্বদেশি যুগের উত্তাল রাজনীতির সঙ্গেও তাঁর জীবন গভীরভাবে জড়িয়ে ছিল।

মিস্ মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল যখন ভারতে এসেছিলেন, তখনও তাঁর সামনে ভবিষ্যতের পথটি এত স্পষ্ট ছিল না। আয়ারল্যান্ডে জন্ম নেওয়া এই শিক্ষিতা নারী ভারতকে প্রথমে চিনেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের চোখ দিয়ে। কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ভারত তাঁর কাছে কোনও দূরদেশের বিষয় হয়ে রইল না। ভারতীয় সমাজ, তার দুঃখ, তার দারিদ্র্য, তার অসহায়তা যেমন তাঁকে ব্যথিত করেছিল, তেমনই ভারতীয় সভ্যতার গভীরতা, মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি এবং তার অতীতের গৌরব, ঐতিহ্য তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে যে শিক্ষা দিয়েছিলেন, তার কেন্দ্রে ছিল মানুষের আত্মশক্তি। পরাধীন দেশের ক্ষেত্রে সেই আত্মশক্তির অর্থ যে একদিন রাজনৈতিক স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় পৌঁছবে। ভগিনী নিবেদিতার জীবন তারই এক আশ্চর্য উদাহরণ।

ভগিনী নিবেদিতা বুঝেছিলেন— একটি জাতিকে স্বাধীন করতে হলে শুধু শাসকের বিরুদ্ধে ক্ষোভ সৃষ্টি করলেই হয় না, মানুষের নিজের সম্পর্কে ধারণাটাকেও বদলাতে হয়। যে জাতি নিজেকে দুর্বল মনে করে, যে জাতি নিজের ইতিহাসকে ভুলে যায়, যে জাতি নিজের সংস্কৃতিকে অবজ্ঞা করতে শেখে, তার হাতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা এলেও সে স্বাধীনতার ভিত শক্ত হয় না। তাই তাঁর কাছে শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প, বিজ্ঞান, নারীজাগরণ ও জাতীয়তাবোধ— সবকিছু একই বৃহৎ কাজের বিভিন্ন দিক। এই ভাবনা থেকেই তাঁর রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ।

১৯০১ সালের কলকাতা কংগ্রেসে তাঁর উপস্থিতি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ভারতীয় রাজনীতির তৎকালীন নেতাদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়, তাঁদের সঙ্গে মতবিনিময় হয়। কিন্তু কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনের রাজনীতি তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তাঁর মনে তখন আরও তীব্র একটি প্রশ্ন জন্ম নিয়েছে— যে দেশ পরাধীন, সে দেশ কি কেবল আবেদন-নিবেদন জানিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় তরুণ জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী শ্রীঅরবিন্দের। বরোদায় তাঁদের সাক্ষাৎ ভারতীয় ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। শ্রীঅরবিন্দ তখন যে রাজনৈতিক চিন্তার ভিত তৈরি করছিলেন, তার সঙ্গে নিবেদিতার ভাবনার আশ্চর্য মিল ছিল। স্বাধীনতা তাঁদের কাছে কোনও দূরবর্তী স্বপ্ন ছিল না; ছিল জাতীয় জীবনের অপরিহার্য দাবি। পরবর্তী সময়ে শ্রীঅরবিন্দ নিজেই ভগিনী নিবেদিতার রাজনৈতিক ভূমিকার কথা স্মরণ করেছেন। তাঁর স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়— বিপ্লবী সংগঠনগুলিকে বৃহত্তর একটি কাঠামোর মধ্যে সংগঠিত করার প্রাথমিক প্রচেষ্টার সঙ্গেও ভগিনী নিবেদিতার যোগাযোগ ছিল। এই তথ্যটিই প্রমাণ করে— তাঁকে শুধু বক্তৃতা দেওয়া বা স্বদেশি প্রচার করা এক সমাজসেবিকার পরিচয়ে আটকে রাখলে তাঁর জীবনকে ছোটো করে দেখা হয়।

তবে ভগিনী নিবেদিতার রাজনৈতিক ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে একটি সতর্কতা জরুরি। তাঁকে নিয়ে পরবর্তীকালে অনেক গল্প, কিংবদন্তি ও অতিরঞ্জিত দাবি প্রচলিত হয়েছে। তিনি বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ যোগাযোগ রেখেছিলেন, তাঁদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করেছিলেন— এ বিষয়ে যথেষ্ট ঐতিহাসিক উপাদান আছে। কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট গোপন সশস্ত্র কর্মকাণ্ডের প্রত্যক্ষ পরিচালক হিসেবে তাঁকে চিহ্নিত করা ইতিহাসের তথ্যের তুলনায় বেশি দূর এগিয়ে যাওয়া হবে। ভগিনী নিবেদিতার গুরুত্ব অন্যত্র; তিনি ছিলেন সেই সময়ের জাতীয়তাবাদী তরুণদের কাছে এক অসাধারণ নৈতিক শক্তির উৎস।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা ভারতীয় রাজনীতির গতিপথই বদলে দিয়েছিল। বঙ্গের রাস্তায় তখন প্রতিবাদের ঢেউ। ‘বন্দে মাতরম্’ শুধু একটি গান নয়, হয়ে উঠেছে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের মন্ত্র। বিদেশি পণ্য বর্জন, স্বদেশি দ্রব্য গ্রহণ, জাতীয় শিক্ষা— সবকিছু মিলিয়ে তৈরি

হচ্ছে এক নতুন রাজনৈতিক আবহ। এই সময় ভগিনী নিবেদিতা আর দর্শকের ভূমিকায় ছিলেন না। তিনি নেমে এলেন মানুষের মধ্যে।

তাঁর কাছে স্বদেশি ছিল না কেবল বিদেশি কাপড় পোড়ানোর আন্দোলন। তিনি মনে করতেন— স্বদেশি মানে নিজের শক্তিকে চিনে নেওয়া। নিজের হাতে তৈরি জিনিস ব্যবহার করা যেমন তার অংশ, তেমনই নিজেদের ইতিহাসকে সম্মান করা, নিজেদের শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করা, নিজেদের বিজ্ঞানীকে উৎসাহ দেওয়া এবং নিজের সন্তানদের এমন শিক্ষা দেওয়া, যাতে তারা নিজেদের জাতি সম্পর্কে লজ্জিত না হয়— এসবও স্বদেশিরই অঙ্গ। এই কারণেই ভগিনী নিবেদিতার রাজনৈতিক ভাবনাকে তাঁর বিদ্যালয় থেকে আলাদা করা যায় না। বাগবাজারের সেই ছোট্ট বিদ্যালয়ে তিনি মেয়েদের শুধু পড়তে শেখাননি। তাঁদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগরণ-সহ দেশকে জানার আকাঙ্ক্ষা জাগাতে চেয়েছিলেন। তাঁর কাছে শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল এমন মানুষ তৈরি করা, যারা নিজের জীবনকে বৃহত্তর কোনও আদর্শের সঙ্গে যুক্ত করতে পারে।

তাঁর রাজনৈতিক চেতনার প্রকাশ ঘটেছিল শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও। ভারতীয় শিল্পকে তিনি গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বঙ্গীয় শিল্পচর্চার নবজাগরণের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। ভারতীয় শিল্প যেন পাশ্চাত্যের অনুকরণের মধ্যে নিজের স্বর হারিয়ে না ফেলে, সে বিষয়ে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। একটি পরাধীন জাতির শিল্পও যে তার আত্মপরিচয়ের বাহক হতে পারে— ভগিনী নিবেদিতা এই সত্যটি খুব গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন।

ভারতের বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা বিস্ময়কর। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রতি তাঁর যে অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল, তা নিছক ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের বিষয় ছিল না। তিনি মনে করতেন, ভারতীয় মেধা কোনও অংশে ইউরোপীয় মেধার চেয়ে কম নয়। একজন ভারতীয় বিজ্ঞানীর কাজকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরাও তাঁর কাছে জাতীয় আত্মমর্যাদার প্রশ্ন।

এই জায়গাতেই নিবেদিতার রাজনৈতিক দর্শনকে বুঝতে সুবিধা হয়। তিনি রাজনীতিকে কেবল সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন হিসেবে দেখেননি। তাঁর কাছে রাজনীতি ছিল জাতিকে ভিতর থেকে শক্তিশালী করার একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। আর সেই কারণেই বিপ্লবী তরুণদের প্রতিও তাঁর আকর্ষণ ছিল। তাঁদের মধ্যে তিনি শুধু বোমা বা বন্দুকের সম্ভাবনা দেখেননি; দেখেছিলেন আত্মত্যাগের মানসিকতা। তাঁদের কাছে তিনি বারবার চরিত্র, শৃঙ্খলা ও আদর্শের কথা বলতেন। বিপ্লব তাঁর কাছে নিছক হিংসার পথ ছিল না— জাতীয় মুক্তির জন্য নিজের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করার প্রস্তুতি ছিল তার মূল কথা।

শ্রীঅরবিন্দ, বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ এবং সেই সময়ের বহু তরুণ জাতীয়তাবাদীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ এই বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিসরের মধ্যেই গড়ে উঠেছিল। তাঁর বাগবাজারের বাড়িটি অনেক সময় হয়ে উঠত নানা মতের মানুষের মিলনস্থল। সেখানে ভারতীয় রাজনীতি নিয়ে আলোচনা যেমন হয়েছে, তেমনই হয়েছে শিক্ষা, শিল্প, বিজ্ঞান ও ভারতের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথাবার্তা। তবে এই রাজনৈতিক পথ সহজ ছিল না।

ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এক সময় একটি সূক্ষ্ম সমস্যা বা এক ধরনের জটিলতা সৃষ্টি হয়। স্বামীজীর নির্দেশ মেনে মিশন নিজেকে সরাসরি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে রাখতে চেয়েছিল। অন্যদিকে ভগিনী নিবেদিতার রাজনৈতিক অবস্থান তখন ক্রমেই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে চলেছে। শেষপর্যন্ত তিনি মিশনের সঙ্গে তাঁর আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক থেকে সরে দাঁড়ান। এই বিচ্ছেদকে তাঁর জীবনের বেদনাময় অধ্যায় বলা যায়, কিন্তু এটাও সত্য যে তিনি তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাস ও মতাদর্শ থেকে সরে আসেননি। এখানেই ভগিনী নিবেদিতার চরিত্রের দৃঢ়তা। তিনি জানতেন, তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য স্বামীজীর প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানকে কোনো সমস্যায় পড়তে দেওয়া যায় না। তাই নিজের পথ নিজেই বেছে নিলেন। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা তাঁর জীবন থেকে কখনও মুছে গেল না। বরং সেই শিক্ষাকেই তিনি অন্যভাবে বহন করে চললেন— মানুষ গড়ার মধ্য দিয়ে, জাতীয় আত্মমর্যাদা জাগিয়ে তোলার মধ্য দিয়ে, ভারতের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে নিজের জীবনের সাধনায় পরিণত করার মধ্য দিয়ে।

১৯০৮ সালের আলিপুর বোমা মামলা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ওপর বড়ো আঘাত নিয়ে এল। বহু তরুণ বিপ্লবী গ্রেপ্তার হলেন। ব্রিটিশ সরকারের নজরদারি আরও কঠোর হলো। এই সময় ভগিনী নিবেদিতার রাজনৈতিক যোগাযোগও নতুন মাত্রা পেল। তিনি বিদেশে গিয়েও ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে পাশ্চাত্যের মানুষকে জানানো এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের প্রতি সহানুভূতি তৈরি করা তাঁর কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে।

এদিকে তাঁর নিজের শরীর তখন ক্রমশ ভেঙে পড়ছে। কিন্তু কাজ থামেনি। কখনও বিদ্যালয়, কখনও বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর গবেষণার পাশে দাঁড়ানো, কখনও শিল্পীদের উৎসাহ দেওয়া, কখনও জাতীয়তাবাদী তরুণদের সঙ্গে আলোচনা— সব মিলিয়ে তাঁর জীবন যেন বিশ্রামহীন এক যাত্রা।

১৯১১ সালের ১৩ অক্টোবর দার্জিলিঙে তাঁর প্রয়াণ হয়। বয়স তখন মাত্র তেতাল্লিশ। দার্জিলিঙের পাহাড়ে তাঁর সমাধির ওপর আজও লেখা রয়েছে— 'Here reposes Sister Nivedita who gave her all to India.' এই কয়েকটি শব্দের মধ্যে যেন তাঁর সমগ্র জীবনের সারাংশ লুকিয়ে রয়েছে। তিনি সত্যিই তাঁর সবকিছু ভারতকে দিয়েছিলেন।

কিন্তু ভগিনী নিবেদিতাকে কেবল 'ভারতের জন্য জীবন উৎসর্গকারী বিদেশিনী' বললে তাঁর রাজনৈতিক গুরুত্বও যেন খানিকটা আড়াল হয়ে যায়। তিনি এমন এক সময় ভারতে এসেছিলেন, যখন ভারতীয় জাতীয়তাবোধ তখনও তার পূর্ণ রাজনৈতিক রূপ পায়নি। তিনি সেই জাতীয়তাবোধকে মানুষের জীবনের নানা ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছিলেন। তাঁর কাছে দেশপ্রেম মানে ছিল না শুধু পতাকা বা স্লোগান। ভগিনী নিবেদিতার 'দেশপ্রেম' মানে জাতিকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলা, নিজের সংস্কৃতিকে ভালোবাসা, নিজের মেধাকে সম্মান করা এবং প্রয়োজনে নিজের স্বার্থ বিসর্জন দেওয়া।

আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ভগিনী নিবেদিতার জীবনকে তাই নতুন করে জানার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ তাঁর মহাজীবন আমাদের মনে করিয়ে দেয়— স্বাধীনতার আন্দোলন শুধু রাজনৈতিক নেতাদের বক্তৃতা, বিপ্লবীদের গোপন বৈঠক কিংবা রাস্তায় মিছিলের ইতিহাস নয়। তার ভিত তৈরি হয় স্কুলঘরে, শিল্পীর তুলিতে, বিজ্ঞানীর গবেষণাগারে, সংবাদপত্রের পাতায় এবং অসংখ্য মানুষের নীরব আত্মত্যাগে। সেই ইতিহাসে ভগিনী নিবেদিতার স্থান স্বতন্ত্র।

তিনি ভারতীয় হয়ে জন্মাননি। কিন্তু ভারতকে ভালোবাসার জন্য, ভারতবাসীর জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করার জন্য তাঁর কোনো জন্মসূত্রের প্রয়োজন হয়নি। তাঁর ভারতপ্রেম অর্জিত— চিন্তায়, কর্মে, আত্মত্যাগে। আর সেই কারণেই ইতিহাসের কাছে মিস্ মার্গারেট নোবল একদিন হারিয়ে গিয়েছিলেন; থেকে গিয়েছিলেন শুধু— ভগিনী নিবেদিতা। □



দক্ষিণ দিনাজপুরের ত্রিমোহিনীর শ্রীশ্রী বিকট কালীমাতার মন্দির আজও স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে রয়েছে

বিদ্যুৎ সরকার

লক্ষ্মণ সেনের মন্দির প্রতিষ্ঠা থেকে তুর্কি আক্রমণ, চামুণ্ডা থেকে লোকসংস্কৃতি, ইতিহাস থেকে বারেন্দ্রীর গ্রামীণ সংস্কৃতি সযত্নে কালের প্রবাহে বয়ে নিয়ে চলেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ত্রিমোহিনীর বিকট কালীমাতার মন্দির। উত্তরবঙ্গে এমন ঐতিহাসিক কালী মন্দিরের জুড়ি মেলা ভার। সরকারি উদ্যোগের অপ্রতুলতা থাকলেও দেবীর মাহাত্ম্যের ব্যাপ্তি ছড়িয়ে পড়েছে।

মধাইনগর তাম্রলিপি থেকে জানা যায়, ১১৭৯ খ্রিস্টাব্দে সেন বংশের রাজা লক্ষ্মণ সেন সিংহাসন লাভ করেন। লক্ষ্মণ সেন তাঁর অভিষেক উপলক্ষ্যে ঐন্দ্রী মহাশান্তি উৎসব সম্পাদনের জন্য অথর্ববেদের পৈপ্পলাদ শাখানুধ্যায়ী ব্রাহ্মণ শান্ত্যাগারিক পদে অধিষ্ঠিত কৌশিক গোত্রভুক্ত গোবিন্দ দেবশর্মা নামক এক ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করেছিলেন। তার দানকৃত ভূমির অবস্থান ছিল বরেন্দ্রীর অন্তর্গত 'দাপনীয়া পাঠক'। সেই থেকে ওই দানকৃত ভূমিতেই অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে শ্রীশ্রী বিকট কালীমাতা ঠাকুরাণী'র পূজা।

লক্ষ্মণ সেন থেকে তুর্কি আক্রমণ এবং কংগ্রেস-বাম -তৃণমূল পরিচালিত সরকারের আক্রমণ সহ্য করে ইতিহাস ও হিন্দু সংস্কৃতির নিদর্শন রূপে শ্রীশ্রী বিকট কালীমাতা ঠাকুরাণী মন্দির আজও সগৌরবে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

১২০৬ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার খিলজি বরেন্দ্র আক্রমণ করলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় শ্রীশ্রী বিকট কালীমাতা ঠাকুরাণীর মন্দির। তারপর দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরে মধ্যযুগে কোনো সাধকের হাত ধরে এখানে গড়ে ওঠে একটি ছোটো মন্দির এবং উপাসনা কেন্দ্র। তারপরেই ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দের (১১২৫ বঙ্গাব্দে) নবাব মুর্শিদকুলি খাঁয়ের শাসনকালে তৎকালীন দিনাজপুরের জমিদার গৌরীকান্ত মিত্র দিনাজপুর কালেক্টরে রেজিস্ট্রি করে শ্রীশ্রী বিকট কালীমাতা ঠাকুরাণী মন্দিরের জন্য ভূমি দান করে। ওই দানপত্রে নওগাঁর পঞ্চানন উপাধ্যায় নামে এক ব্রাহ্মণকে রাজ পুরোহিতের দায়িত্ব দিয়ে মন্দিরের



চামুণ্ডা নাচ

সেবাইত নিযুক্ত করে ২১ একর ১৬ কাঠা ভূমিদান করেন। ওই দানকৃত ভূমির ৩.৩ একর আজও রয়েছে চকদাপট মৌজায়।

কালের নিয়মে শব্দের অপভ্রংশে দাপনীয়া পাঠক ভূমি চকদাপট ও কিসমতদাপট মৌজায় পরিণত হয়েছে। স্থানীয় লোকমুখে বিকট কালী থেকে দাপট কালী নামেও বহুল প্রচারিত। চকদাপট ও কিসমতদাপট মৌজা সংলগ্ন শ্রীকৃষ্ণপুর, শ্রীরামপুর, পূর্ব গোবিন্দপুর, পূর্ব কালিকাপুর, পূর্ব ঠাকুরপুর, পূর্ব জগন্নাথপুর, গোঁসাইপুর, চকমোহন, মুরারীপুর, শ্যামপুর মৌজার নামকরণই এই এলাকায় সনাতন ধর্মচারণের সাক্ষ্য বহন করছে।

বিকট কালীমাতার দেবীমূর্তিবিহীন মুখোশ-ভিত্তিক চামুণ্ডাপূজা এক স্বতন্ত্র লোকায়ত ধর্মাচারের রূপ নিয়েছে। এখানে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের বেদোচ্চারণ পূজার বহিরঙ্গ; অথচ পূজার মূল সঞ্চালক দেবাংশী, একজন অব্রাহ্মণ পুরুষ যিনি ভীষণ দর্শন চামুণ্ডার মুখোশ ধারণ করে, শাড়ি পরিধান করে ভক্তদের সামনে রূপান্তরিত হয় শক্তিরূপিণীতে। নৃত্য, নির্দেশ, আরোগ্য, বিধান ও ভক্তকণ্ঠের আর্তি শোনার মাধ্যমে দেবী ও মানুষের একাত্মতা এখানে প্রকাশ পায়। লোকবিশ্বাস যে, শক্তিপূজা ও হিন্দু ধর্মদর্শনের বিবর্তনের অনন্য দলিল রূপে এই চামুণ্ডা পূজা আজও জীবন্ত ঐতিহ্য বহন করে চলেছে।

চৈত্র সংক্রান্তিতে শ্রীশ্রী বিকট কালীমাতা ঠাকুরাণীর বার্ষিক মহাপূজা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। চৈত্র সংক্রান্তির ৯ দিন আগে মায়ের মঙ্গলঘট প্রতিষ্ঠা করে মহাপূজার শুভারম্ভ হয়। মহাপূজার ৫ দিন আগে ক্ষৌরকর্মের মাধ্যমে ভক্ত বা সন্ন্যাসীদের ব্রতের শুভারম্ভ হয়। বিশেষ রীতিতে ৫ দিনের ভক্ত বা সন্ন্যাসীর ব্রত পালন করে পুরুষেরা। মহাপূজার ১ দিন আগে মায়ের মন্দিরে মশান অনুষ্ঠিত হয়। প্রাচীনকালের রীতি মেনেই মায়ের ৯ দিনের এই পূজাতে সমস্ত নিয়ম শুদ্ধাচারে পালন করা হয়।

হিলি থানার চকদাপট মৌজায় শ্রীশ্রী বিকট কালীমাতা ঠাকুরাণী মায়ের ভব্য মন্দির রয়েছে। সুপ্রাচীনকালের ঐতিহ্য পরম্পরা মেনে প্রতি বছর চৈত্র সংক্রান্তিতে শ্রীশ্রী বিকট কালীমাতা ঠাকুরাণী মায়ের বার্ষিক মহাপূজায় দেশবিদেশ থেকে ৫ লক্ষের বেশি তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়। তারই সঙ্গে সারাবছরই মায়ের মন্দিরে পুণ্যার্থী ও তীর্থযাত্রীর সমাগম ঘটে।

বালুরঘাট, হিলি ও পতিরাম থানা মিলিয়ে ৫০টিরও বেশি গ্রামে শ্রীশ্রী বিকট কালীমাতা ঠাকুরাণী মায়ের মন্দিরের ৮৪টি দলে ৩০০টির বেশি চামুণ্ডা রয়েছে। শ্রীশ্রী বিকট কালীমাতা ঠাকুরাণী মায়ের বার্ষিক মহাপূজার সব মিলিয়ে ৬ হাজারের বেশি পুরুষ ভক্ত বা সন্ন্যাসী ব্রতী হন। শ্রীশ্রী বিকট কালীমাতা ঠাকুরাণী মায়ের বার্ষিক মহাপূজায় ১০ হাজারের বেশি মহিলা মাথায় করে বাঁশের ডালায় কাঁচা গোটা ফলের প্রসাদি ডালা উৎসর্গ করেন। মায়ের এই বার্ষিক পূজায় সুপ্রাচীন লোকক্রিয়া ও লোকসংস্কৃতির সমাহার দর্শনে বিপুল তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়।

শ্রীশ্রী বিকট কালীমাতা ঠাকুরাণী মায়ের চামুণ্ডা পূজা ও নৃত্য দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার লোকসংস্কৃতির অনন্য নিদর্শন এবং ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, সৃজনশীলতা সুপ্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষী। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বৃহত্তম আর্টস্ ফেস্টিভ্যাল এবং পৃথিবীর বৃহত্তম চামুণ্ডা কালীক্ষেত্র শ্রীশ্রী বিকট কালীমাতা ঠাকুরাণী মন্দির বললেও ভুল হবে না।

দক্ষিণ দিনাজপুরের সুপ্রাচীন এই উপাসনা কেন্দ্রে তুর্কি আক্রমণ অর্থাৎ বখতিয়ার খিলজির আক্রমণে প্রথম বিকট কালীমাতার মন্দির আক্রান্ত হয়। স্বাধীনতার পরও কংগ্রেসি নেতার আক্রমণে বিকট কালীমাতা ভূমি গ্রাস করা হয়। ১৯৮০ সালের দিকে বামফ্রন্ট সরকারের আমলেও বিকট কালীমাতার ভূমি বেদখল করে বিতরণ করা হয়। ২০১৯ থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্তও তৃণমূলি আগ্রাসনে বিকট কালীমাতার ভূমি বেদখল করা এবং মন্দির কমিটির সদস্যদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে জেল খাটানো হয়। লক্ষ্মণ সেন থেকে তুর্কি আক্রমণ এবং কংগ্রেস-বাম-তৃণমূল পরিচালিত সরকারের আক্রমণ সহ্য করে ইতিহাস ও হিন্দু সংস্কৃতির নিদর্শন রূপে শ্রীশ্রী বিকট কালীমাতা ঠাকুরাণী মন্দির আজও সগৌরবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। □

ভাগীরথী নাম ফিরিয়ে দেওয়া হোক

মুর্শিদাবাদ জেলায় গিরিয়ার গঙ্গা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একভাগ পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে পদ্মা নামে পরিচিত। অন্যভাগ দক্ষিণমুখী হয়ে ভাগীরথী নামে পরিচিত। ভাগীরথী গিরিয়া থেকে যাত্রা শুরু করে কলকাতা হয়ে গঙ্গাসাগরে বঙ্গোপসাগরে মিলিত হয়েছে। ব্রিটিশ আমলে ভাগীরথীর দক্ষিণ অংশের নাম হুগলী করা হয় যা আজও চলছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে নবদ্বীপ থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত নাম হুগলী নদী। গঙ্গা ভারতের জাতীয় নদী। আবার গঙ্গাসাগর মানে গঙ্গা ও সাগরের মিলন। অর্থাৎ পৌরাণিক যুগে নাম ছিল গঙ্গা। এখনো লোকমুখে গঙ্গাই। কিন্তু সরকারি স্তরে নবদ্বীপ থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত নাম হুগলী। এই অবস্থায় হুগলী নদী নাম বাদ দিয়ে ফিরিয়ে আনা হোক ঐতিহ্যবাহী নাম ভাগীরথী বা ভাগীরথী-গঙ্গা।

—**রাজকুমার জাজোদিয়া,**
কালিয়াগঞ্জ।

মাত্র তিন মাস!

হ্যাঁ, মাত্র তিন মাস যেতে না যেতেই কিছু নকু-মাকু-সেকু-খিলজি গোষ্ঠী নতুন একটি ন্যারেটিভ তৈরির কাজে নেমে পড়েছে। ন্যারেটিভটা হলো? 'এইজন্যই কি আমরা পরিবর্তন চেয়েছিলাম?' প্রশ্নটা শুনতে খুব নিরীহ। কিন্তু এর মধ্যে যে রাজনৈতিক ভণ্ডামিটা লুকিয়ে আছে, সেটা বুঝতে খুব বেশি রাজনৈতিক জ্ঞান লাগে না। কারণ প্রথমেই একটা বিষয় পরিষ্কার করা দরকার— আপনারা পরিবর্তন চেয়েছিলেনই-বা কবে? আপনারা তো এই সরকারকে ক্ষমতায় আনার জন্য ভোট দেননি। বরং এই সরকার যাতে ক্ষমতায় না আসে, তার জন্যই ভোট দিয়েছিলেন।

রাজনৈতিক ভণ্ডামিরও একটা সীমা থাকা উচিত! আসল স্টেকহোল্ডার কারা, সেটা আগে বুঝুন এই সরকারের আসল স্টেকহোল্ডার আপনারা নন। আসল স্টেকহোল্ডার হলেন সেই মানুষগুলো, যারা দীর্ঘ ৪৯ বছরের রাজনৈতিক অব্যবস্থা, তোষণনীতি, প্রশাসনিক পক্ষপাত, সাংস্কৃতিক একচেটিয়াতন্ত্র এবং নির্দিষ্ট মতাদর্শের দাদাগিরির বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন। তাঁরাই পরিবর্তন চেয়েছেন। তাঁরাই পরিবর্তন এনেছেন। তাঁদের প্রত্যাশা ছিল— প্রকাশ্য তোষণনীতির অবসান- প্রশাসনে নিরপেক্ষতা, আইনশৃঙ্খলায় কঠোরতা, দুর্নীতি ও সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে একচেটিয়া মতাদর্শিক আধিপত্যের অবসান; সাধারণ মানুষের আত্মসম্মান ফিরিয়ে আনা। এখনো সব কাজ হয়নি। অনেক কাজ বাকি। কিন্তু তাঁরা কি তিন মাসেই তাঁদের ভোটের সিদ্ধান্ত নিয়ে আফশোস শুরু করেছেন? না কারণ তাঁরা আপনাদের মতো রাজনৈতিক ইউটিউব-কমেন্টেটর নন। তাঁরা বাস্তব মানুষ। তাঁরা জানেন সরকার চালাতে সময় লাগে। কিছু ইঙ্গিতই আপাতত যথেষ্ট। গত ৪৯ বছর ধরে রাজ্যে যে ধরনের প্রকাশ্য তোষণনীতি এবং নির্দিষ্ট মতাদর্শের সাম্রাজ্য তৈরি হয়েছিল, সেটাকে চ্যালেঞ্জ করার ইঙ্গিতই আপাতত অনেকের কাছে যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক। যাদবপুরের মতো প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিনের মাকু-নকু প্রভাবকে ভাঙার সম্ভাবনা— এটা নিছক প্রশাসনিক বিষয় নয়। এটা একটা প্রতীক।

এই রাজ্যে শিক্ষা, সংস্কৃতি, বুদ্ধিবৃত্তিক পরিসর এবং জনমত তৈরির জায়গাগুলো আর কারও পৈতৃক সম্পত্তি থাকবে না। এই পরিবর্তনের ইঙ্গিতেই অনেকে আপাতত সন্তুষ্ট। কারণ তাঁরা জানেন, ৪৯ বছরের জমাট কাঠামো তিন মাসে ভাঙা যায় না। স্টেকহোল্ডাররা সময় দেবেন, কিন্তু হিসেবও রাখবেন। যারা পরিবর্তন এনেছেন, তাঁরা অবুঝ নন। তাঁরা অন্ধ সমর্থকও নন। তাঁরা জানেন কোথায় সরকার ভালো করছে, কোথায় আরও কঠোর হওয়া দরকার, কোথায় গতি বাড়াতে হবে এবং কোথায় প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। তাঁরা সময় দেবেন। কিন্তু সময় দেওয়া মানে হিসেব না রাখা নয়। তারা সব দেখছেন। সব বুঝছেন। সব মনে রাখছেন। আর প্রয়োজনে নিজেদের রাজনৈতিক হিসেব নিজেরাই বুঝে নেবেন। তাই যারা তিন মাসের মাথায় পরিবর্তনের সার্টিফিকেট দিতে শুরু করেছেন, তাঁদের বলি— আপনাদের সার্টিফিকেটের জন্য এই পরিবর্তন আসেনি। যারা পরিবর্তন এনেছেন, তাঁদের প্রত্যাশা পূরণের জন্যই এই পরিবর্তন এসেছে। তাই নকু-মাকু-সেকু-খিলজিরা আপাতত একটু সাইডে চেপে বসুন। ৪৯ বছর ধরে রাজ্যে আপনাদের দাদাগিরি, তোষণনীতি, রাজনৈতিক উপদ্রব এবং সাংস্কৃতিক একচেটিয়াতন্ত্র মানুষ দেখেছে। এবার একটু অন্যদেরও কাজ করতে দিন। পরিবর্তন এসেছে। পরিবর্তনের প্রক্রিয়া চলছে। আর পরিবর্তনের কাণ্ডারিরা আপনাদের কাছ থেকে কোনো সার্টিফিকেট চাননি।

—**সৌরভ চক্রবর্তী,**
উত্তরপাড়া, হুগলী।

প্রসঙ্গ : 'শারদ সম্মান'

'শারদ-সম্মান' শব্দটির অর্থ কী? শরৎ ঋতুতে অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজা সম্পর্কিত সম্মান কি? যে ধর্মকর্ম আপামর বাঙ্গালির চিন্তা-চেতনাকে গভীরভাবে আলোড়িত করে তোলে। প্রকৃতার্থে শরৎ ঋতুতে বিশ্বজননী দশপ্রহরণধারিণী মাতা পার্বতী কৈলাস থেকে সপরিবারে মর্ত্যভূমিতে অবতারিতা হন। মর্ত্যভূমিতে তাঁর সন্তানেরা ত্রিতাপ জ্বালায় জর্জরিত হয়েও বৎসরান্তে একটিবার ভক্তি-বিগলিত-চিত্তে চিন্ময়ী মায়ের মৃন্ময়ীর চরণে দু'ফোঁটা অশ্রু নিবেদন করে তাপিত হৃদয়কে শান্ত করার কথা। সেক্ষেত্রে সম্মানের প্রশ্ন উঠে কী করে? চিন্ময়ী মায়ের মৃন্ময়ীমূর্তি তৈরির প্রতিযোগিতা, ঝাঁ-চকচকে প্যান্ডেল তৈরির প্রতিযোগিতা, পরিবেশ-বান্ধব দেবাঙ্গন তৈরির প্রতিযোগিতা। অর্থাৎ ভক্তি বিগলিত-চিত্তে মৃন্ময়ী মায়ের

চরণ-কমলে দু'ফোঁটা অশ্রু নিবেদন করে মানব থেকে দেবত্বে উত্তরণের লক্ষ্যকে ভুলিয়ে দিয়ে জড়-জাগতিক কৃত্রিম জৌলুসের দিকে মানুষকে আকৃষ্ট করিয়ে আসুরিক প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তোলা।

আমি আমার মায়ের মৃন্ময়ী মূর্তি তৈরি করবো— তাতে আবার কীসের আমার মা ভালো--- তোমার মা খারাপ, এই প্রতিযোগিতা? আমার অনেক পয়সা, তাই দিয়ে মায়ের জন্য আমি কি সুন্দর দেবাঙ্গন তৈরি করেছি, লোকে ধন্য-ধন্য করছে। আর তুমি অপাঙ্‌ক্তেয়। আমাদের সনাতন ধর্ম-দর্শন কি এই শিক্ষা আমাদের দিয়েছে? আমাদের শিল্প-নৈপুণ্য প্রদর্শনীর যদি এতই ইচ্ছা— তাহলে পৃথক ভাবে বিভিন্ন প্রকার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা যেতেই পারে। মায়ের অর্চনার অঙ্গনকে নিয়ে এত মাতামাতি কেন? মায়ের মৃন্ময়ীমূর্তিকে কেন্দ্র করে এক প্রকার প্রবণতা এবার অপেক্ষাকৃত কম। তা' হলো 'থিমপূজা'। আরও একটা প্রবণতা মাঝে খুব চালু হয়েছিল— তা হলো নায়ক-নায়িকাদের মুখের আদলে মা লক্ষ্মী, সরস্বতী ও কার্তিক-গণেশের মুখ তৈরি করা। আর ভিলেনের মুখের আদলে অসুরের মুখ। ভাবুন তো— মায়ের মৃন্ময়ীমূর্তি নিয়ে এসব ভাবা যায়।

আচ্ছা--- মাকে কি আমরা সত্যিই ভালোবাসি? না, মোটেই না। পূজা দেখতে বেরিয়ে আমরা কোন প্যান্ডেলে যাই? যে প্যান্ডেলের ডেকোরেশন, লাইটিং প্রতিমা ফার্স্ট হয়েছে। অথচ এমন পূজাও কিন্তু আছে যে পূজায় পরিবারের ৪-৫ জন আর কেউ তা তাকিয়েও দেখেন না। অথচ এই পূজা যিনি করছেন তিনি ভক্তি-বিগলিত-চিত্তে দরবিগলিত অশ্রুর ধারায় মায়ের চরণে পুষ্প-চন্দন লেপন করছেন। তাহলে আমরা মা-কে ভালোবাসি না; ভালোবাসি জৌলুসকে আর খাওয়াদাওয়া, সাজগোজ আর আড্ডায় চারটি দিন অতিবাহিত করে আত্মপ্রসাদ লাভ করি। এমন পূজাও আছে— যা সারা বছর গোরুপাচার-সহ দেশের সম্পদ অবৈধভাবে পাচারকারীদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের তোলা আদায় করে কোটি কোটি টাকা খরচ করা আর সেই পূজায় আবার ৩-৪শো কিলোমিটার দূর থেকে গাড়ি রিজার্ভ করে প্রচুর দর্শক আসেন। এরকম করলে মানুষের দুর্গতি কি কখনো ঘুচবে?

—**বিনয় কৃষ্ণ দাশ,**
উত্তমাশা, বালুরঘাট, দ: দিনাজপুর।

ইলিশ রপ্তানি ও দেশীয় বাজারে ভারসাম্যের দাবি

পেট্রাপোল সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে ইলিশ রপ্তানিকে ঘিরে নতুন করে আলোচনায় এসেছে রপ্তানি ও দেশীয় বাজারের ভারসাম্যের বিষয়টি। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, গত দু'মাসে ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রায় ৫০০ টন ইলিশ রপ্তানি হয়েছে এবং আরও রপ্তানির সম্ভাবনার কথা রয়েছে। একই সঙ্গে সরকারি মৎস্য বিশেষজ্ঞদের বক্তব্যেও ইলিশের ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি, স্থায়ীকরণ ও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার কথা উঠে এসেছে। রপ্তানি থেকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও মৎস্যজীবী-ব্যবসায়ীদের বাজার সম্প্রসারণের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। কিন্তু একই সঙ্গে দেশীয় বাজারে পর্যাপ্ত জোগান এবং সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বিষয়টিও নীতিনির্ধারণে বিবেচনায় থাকা প্রয়োজন। ইলিশের জোগান সীমিত হলে অতিরিক্ত চাহিদা ও রপ্তানি দেশীয় বাজারে দামের উপর চাপ তৈরি করতে পারে— তাই রপ্তানির পাশাপাশি দেশীয় সরবরাহের তথ্য নিয়মিত পর্যবেক্ষণ জরুরি। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে কয়েকটি নির্দিষ্ট দাবি সামনে আসছে— প্রথমত, দেশীয় বাজারের জোগান, পাইকারি ও খুচরো দাম এবং রপ্তানির পরিমাণের উপর নিয়মিত নজরদারি ও প্রকাশ্য তথ্যভিত্তিক পর্যালোচনা করা। দ্বিতীয়ত, দেশীয় চাহিদা ও জোগানের মধ্যে ঘাটতি দেখা দিলে রপ্তানির পরিমাণ সাময়িকভাবে সীমিত করার ব্যবস্থা বিবেচনা করা। তৃতীয়ত, ছোটো ও মাঝারি আকারের ইলিশের নির্বিচার আহরণ বন্ধ করে প্রজননক্ষম মাছ ও কিশোর ইলিশ সংরক্ষণে কার্যকর নজরদারি বাড়ানো। সরকারি মৎস্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানও স্থায়ী ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণকে ইলিশ অর্থনীতির ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

চতুর্থত, দেশীয় বাজারে পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করতে উৎপাদন, সংরক্ষণ, হিমঘর ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা। পাশাপাশি রপ্তানির সুবিধা বজায় রেখেই দেশীয় ভোক্তার স্বার্থরক্ষায় একটি স্পষ্ট 'রপ্তানি দেশীয় জোগান ভারসাম্য নীতি' তৈরি করা যেতে পারে। ইলিশ রপ্তানি দেশের মৎস্য অর্থনীতির জন্য একটি সুযোগ। আবার দেশের সাধারণ মানুষের কাছে ন্যায্য দামে ইলিশ পৌঁছানোও খাদ্যবাজারের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই লক্ষ্য হওয়া উচিত রপ্তানি বন্ধ করা নয়, বরং এমন একটি ভারসাম্য তৈরি করা--- যাতে আন্তর্জাতিক বাজারের সুযোগ বজায় থাকে এবং দেশীয় বাজারেও পর্যাপ্ত ইলিশ ও যুক্তিসঙ্গত দাম নিশ্চিত হয়।

—**কুন্তল চক্রবর্তী,**
খয়রামারী বনগাঁ উ: ২৪ পরগনা।

রাজ্যের মানুষের মনে আশার আলো

গত ২১ সেপ্টেম্বরের স্বস্তিকা পত্রিকায় লেখক মণীন্দ্রনাথ সাহার 'মুখ্যমন্ত্রীর শিল্পে ভরিয়ে দেব উক্তি মানুষের মনে আশা জোগাচ্ছে', প্রবন্ধটি খুবই বাস্তবোচিত ও সময়োচিত। নতুন রাজ্য সরকারের শাসনে রাজ্যে ইতিমধ্যেই সুশাসনের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। রাজ্যে শিল্পবান্ধব পরিবেশ ফিরে এসেছে। তার হাতেগরম প্রমাণ আদানি গোষ্ঠী পশ্চিমবঙ্গে ১০ বছরে লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগের আশ্বাস দিয়েছে। আদানি গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান গৌতম আদানি রাজ্যে বিশাল অঙ্কের বিনিয়োগের পরিষ্কার রোড ম্যাপ তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, '২০৩৫ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ১ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগের রূপরেখা তৈরি করেছে তাঁর গোষ্ঠী। গত ২৪ সেপ্টেম্বর নিউটাউনে 'আদানি আরোগ্য মন্দির'-এর শিলান্যাস অনুষ্ঠান উপস্থিত থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে একথা বলেছেন তিনি। একথা নিশ্চিত যে, পরিযায়ী শ্রমিকরা এবার নিজ রাজ্যে ফিরে আসতে পারবেন। রাজ্যের মানুষের আশীর্বাদ রয়েছে এই নতুন সরকারের মাথায়। এই সরকার দীর্ঘস্থায়ী হোক এটাই কামনা।

—**নিশিরাম মাহাত,** বলরামপুর, পুরুলিয়া।

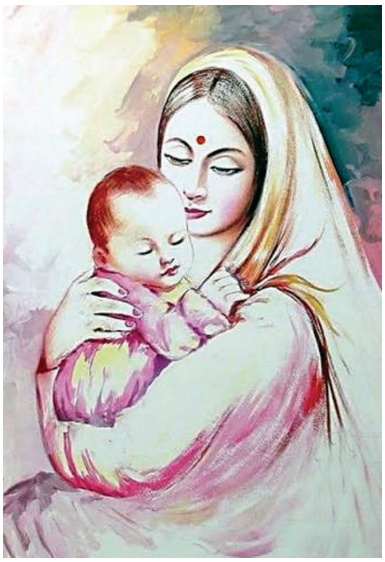

মায়ের হাতেই আগামী ভারতের ভিত

অরুণা রায় চৌধুরী

একটি দেশের ভবিষ্যৎ কেবল তার অর্থনীতি, প্রযুক্তি বা সামরিক শক্তির ওপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে সেই দেশের যুবসমাজের চরিত্র, মূল্যবোধ, দায়িত্ববোধ এবং দেশ সম্পর্কে তাদের ভাবনার ওপর। আর এই যুবসমাজকে গড়ে তোলার প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হলো পরিবার। সেই পরিবারের প্রাণকেন্দ্রে থাকেন মা। একটি শিশু পৃথিবীকে চেনা শুরু করে মায়ের হাত ধরে। কথা বলা, অন্যকে সম্মান করা, সত্য বলা, ভালো-মন্দের পার্থক্য বোঝা, নিজের সংস্কৃতিকে ভালোবাসা, এসব শিক্ষার প্রথম পাঠ সাধারণত বিদ্যালয়ে নয়, পরিবারেই শুরু হয়। UNICEF-এর মতে, শিশুর জীবনের প্রথম কয়েক বছর তার মস্তিষ্কের বিকাশ ও ভবিষ্যৎ শেখার ভিত্তি তৈরির ক্ষেত্রে পরিবার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; এই সময়ে পরিবেশ, পরিচর্যা, কথোপকথন ও ইতিবাচক সম্পর্কের গভীর প্রভাব পড়ে।

শৈশবের শিক্ষা মানে শুধু অ আ ক খ শেখানো নয়। বরং এই সময়েই তৈরি হয় শিশুর চরিত্রের ভিত। একটি শিশু যদি ছোটোবলা থেকে দেখে তার মা-বাবা সত্য কথা বলেন, বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করেন, দরিদ্র ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ান, দেশের আইন ও জাতীয় প্রতীককে সম্মান করেন তাহলে সেই আচরণ শিশুর কাছে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। বিপরীতে, আমরা যদি শিশুর সামনে সারাক্ষণ মিথ্যা, হিংসা, বিদ্বেষ, অসহিষ্ণুতা কিংবা অন্যের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করি, তাহলে সেই পরিবেশও তার মানসিক গঠনে ছাপ ফেলে। তাই শিশুকে শুধু 'ভালো ছেলে' বা 'ভালো মেয়ে' হতে বললেই হবে না; মায়েদের নিজেদের আচরণের মধ্যে দিয়েও সেই শিক্ষা দিতে হবে। প্রথম আট বছরকে শিশুর বিকাশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, এই সময়ে শেখার ভিত্তি তৈরি হয় এবং মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা পরবর্তী শিক্ষাজীবনের ফলাফলেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। আজকের যুবসমাজ প্রযুক্তির যুগে বেড়ে উঠছে। তাদের হাতে বইয়ের পাশাপাশি স্মার্টফোন, সোশ্যাল মিডিয়া এবং অসংখ্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম। তথ্যের অভাব নেই, বরং সমস্যা হলো কোন তথ্য গ্রহণ করবে এবং কোনটি প্রত্যাখ্যান করবে, সেই বিচারবোধ তৈরি করা। এখানেই মায়েদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশুকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ নয়, বরং তার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। সে কী দেখছে, কী পড়ছে, কার সঙ্গে মিশছে, কী নিয়ে ভাবছে, এসব বিষয়ে মায়ের আগ্রহ থাকতে হবে। ভুল করলে শুধু বকাঝকা না করে তার সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। UNICEF-ও ইতিবাচক সম্পর্ক, পর্যাপ্ত সময় দেওয়া, কথা বলা, শোনা এবং সুস্থ সীমারেখা তৈরির ওপর গুরুত্ব দেয়।

জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০-তেও ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি গর্ব, মৌলিক কর্তব্য ও সাংবিধানিক মূল্যবোধ, দেশ ও সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ এবং দেশপ্রেমের সঙ্গে মানবিকতা, মমতা, সহিষ্ণুতা, বৈচিত্র্যের প্রতি সম্মান ও গণতান্ত্রিক মানসিকতার বিকাশের কথা বলা হয়েছে।

প্রথমত, সন্তানকে ভারতের ইতিহাস ও স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃত ঘটনা শোনাতে হবে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, স্বামী বিবেকানন্দ, ভগৎ সিংহ, ক্ষুদিরাম বসু, রানি লক্ষ্মীবাঈ, গান্ধীজী, সর্দার প্যাটেল, ড.বি.আর. আম্বেদকর-সহ অসংখ্য মহান ব্যক্তির জীবন থেকে শিক্ষা দেওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, জাতীয় দিবসগুলিকে শুধু ছুটির দিন হিসেবে না দেখে শিক্ষার দিন হিসেবে পালন করতে হবে। স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস, নেতাজী জয়ন্তী কিংবা শহিদ দিবসের তাৎপর্য সন্তানকে বুঝিয়ে বলতে হবে। তৃতীয়ত, ভারতীয় সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য, ঐতিহ্য ও বৈচিত্র্যের সঙ্গে সন্তানকে পরিচিত করতে হবে। নিজের সংস্কৃতিকে ভালোবাসার পাশাপাশি অন্যের সংস্কৃতির প্রতিও সম্মান শেখাতে হবে। চতুর্থত, সন্তানকে সমাজসেবায় যুক্ত করতে হবে। বৃক্ষরোপণ, পরিচ্ছন্নতা অভিযান, দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়ানো, প্রবীণদের সাহায্য করা কিংবা কোনো সামাজিক উদ্যোগে অংশ নেওয়া। দেশপ্রেমকে শুধু কথায় নয়, কাজে প্রকাশ করতে শেখাতে হবে। সবচেয়ে বড়ো কথা, মাকে নিজের জীবন দিয়েই উদাহরণ তৈরি করতে হবে। কারণ সন্তান মায়ের কথা যতটা শোনে, তার চেয়ে অনেক বেশি মায়ের কাজ দেখে শেখে।

একজন মা যখন সন্তানকে বলেন, 'ভালো করে পড়াশোনা করো', তখন তিনি একজন শিক্ষার্থী তৈরি করেন। কিন্তু যখন বলেন 'সৎ হও, অন্যকে সম্মান করো, নিজের সংস্কৃতিকে ভালোবাসো, দেশের জন্য কিছু করো, দুর্বল মানুষের পাশে দাঁড়াও' তখন তিনি একজন আদর্শ নাগরিক তৈরি করেন। আজকের যুবসমাজই আগামীদিনের ভারত। তাই তাদের হাতে শুধু ডিগ্রি নয়, চরিত্র দিতে হবে; শুধু দক্ষতা নয়, বিবেক দিতে হবে; শুধু উচ্চাকাঙ্ক্ষা নয়, দায়িত্ববোধ দিতে হবে। আর এই কাজের প্রথম পাঠশালা যদি হয় পরিবার, তবে সেই পাঠশালার প্রথম শিক্ষিকা হলেন মা। □



অল্প আঘাতেই নখ ভেঙে যাচ্ছে, কী করবেন!

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

সুস্থ স্বাভাবিক নখ সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ। ত্বক যেমন কেরাটিন দিয়ে তৈরি, নখেও থাকে শক্ত কেরাটিন। স্বাভাবিক নখ হালকা গোলাপি রঙের হয়ে থাকে। স্বাভাবিক নখে কোনো গর্ত, দাগ হয় না, সেটি হয় মসৃণ। অনেক সময়ে দেখা যায় নখ ভঙ্গুর হয়ে যায়। অল্পতেই ভেঙে ভেঙে আসে। ভঙ্গুর নখ বলতে শুষ্ক, ভেঙে যাওয়ার প্রবণতাযুক্ত নখকে বোঝায়। নখ যদি হঠাৎ ভঙ্গুর হয়ে যায়, তাহলে হতে পারে সেটি কোনো সমস্যার লক্ষণ।

নখ ভঙ্গুর হওয়ার কারণ

১. পুষ্টির ঘাটতি।

২. প্রয়োজনীয় ভিটামিনের অভাব (যেমন— বায়োটিন, ভিটামিন-এ, সি, ডি)।

৩. খনিজ পদার্থের ঘাটতি (যেমন— ক্যালশিয়াম, জিংক)।

৪. আয়রনের অভাব। তীব্র আয়রনের অভাবে নখের মাঝখানে বসে গিয়ে আকৃতি পালটে যেতে পারে।

৫. সামগ্রিক পুষ্টিহীনতা।

৬. অত্যধিক আর্দ্রতা।

৭. অতিরিক্ত পরিমাণে জল দিয়ে কাজ করা অথবা যাঁদের বার বার জলে হাত ভেজাতে হয়। যেমন— বাসন ধোয়া, কাপড় কাচা।

৮. বয়স ও হরমোনের পরিবর্তন।

৯. বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নখে আর্দ্রতা ও তেলের পরিমাণ হ্রাস পায়, যার ফলে নখ হয় ভঙ্গুর।

১০. মহিলাদের ক্ষেত্রে মাসিক বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে ভঙ্গুর হয়ে যেতে পারে নখ।

১১. রোগবালাই।

১২. থাইরয়েডের সমস্যা।

১৩. অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস।

১৪. দীর্ঘমেয়াদি কিডনির জটিলতা।

১৫. ত্বকের সমস্যা (সোরিয়াসিস, একজিমা)।

১৬. ছত্রাকের সংক্রমণ।

১৭. উচ্চমাত্রার ওষুধ চললে (যেমন— কেমোথেরাপি)।

১৮. জীবনযাত্রার ধরন।

১৯. অতিমাত্রায় প্রসাধনী ব্যবহারে নখের উজ্জ্বলতা নষ্ট হয়ে যায়।

২০. অ্যাসিটোনসমৃদ্ধ প্রসাধনীর (যেমন— নেলপালিশ রিমুভার) মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার।

২১. দাঁত দিয়ে নখ কামড়ানো।

২২. দীর্ঘমেয়াদি কৃত্রিম নখ এবং জেল ম্যানিকিওরের ব্যবহার।

২৩. পরিবেশগত কারণ।

২৪. রাসায়নিক দ্রব্যাদি (যেমন— ক্লোরিন জাতীয় তরল, ব্লিচিং পাউডার) নখের ক্ষতি করে।

২৫. অতিরিক্ত ঠাণ্ডা, শুষ্ক আবহাওয়া।

২৬. অতিরিক্ত তাপ বা সূর্যের এক্সপোজার।

নখ ভালো রাখতে কী করবেন

পুষ্টি

১. ভিটামিন ও খনিজসমৃদ্ধ পুষ্টিকর সুষম খাদ্য প্রতিদিন গ্রহণ করুন।

২. মরসুমি শাকসবজি, ফলমূল নিয়মিত গ্রহণ করুন।

৩. নিয়মিত জল পানের দিকে নজর দিন। নখের নমনীয়তা বজায় রাখতে সঠিক হাইড্রেশন অপরিহার্য।

৪. পুরোনো নেলপালিশ খুঁটে তুলবেন না।

৫. নখ দিয়ে টিনের বা বোতলের ছিপি খোলা বা ধারালো জিনিস ঘষা ঠিক নয়।

৬. নখ ও ত্বকে নিয়মিত ময়েশ্চরাইজার ব্যবহার করে মসৃণ রাখুন।

৭. ভেঙে যাওয়া এড়াতে নিয়মিত ট্রিম করুন।

প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা

১. রাসায়নিক ব্যবহার বা বাসন ধোয়ার সময় গ্লাভস্ পরে নিন।

২. কঠোর ডিটারজেন্ট ব্যবহার এড়িয়ে চলুন।

পরামর্শ

ভঙ্গুর নখ থাকলে একজন চর্মরোগ বা মেডিসিন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী পরীক্ষানিরীক্ষা করিয়ে কোনো দীর্ঘমেয়াদি অসুখে ভুগছেন কিনা, নিশ্চিত হয়ে নিন। ডায়াবেটিস, থাইরয়েড, ত্বক কিডনির সমস্যা থাকলে তার চিকিৎসা করুন এবং নিয়ন্ত্রণে রাখুন। এক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ফলপ্রসূ। □



JANAK POSITIONING & SURVEYING SYSTEMS PVT. LTD.

H.O. - 304B, Pal Mohan Plaza, 11/56 D.B. Gupta Road, Karol Bagh, Delhi-110005
B.O. - B-28 Sector-4, Noida-201301, Email id - janak.ji@yahoo.com
Website - www.janaksurvey.com



নিউটাউনে ডাঃ হেডগেওয়ার স্মারক সমিতির 'কেশব স্মৃতি' ভবন উদ্বোধনের দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠান

গত ২৩ সেপ্টেম্বর কলকাতার নিউটাউনের অ্যাকশন এরিয়া ২ডি, ১২ নং জল ট্যাঙ্কের কাছে ডাঃ হেডগেওয়ার স্মারক সমিতির 'কেশব স্মৃতি' সেবা ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে বাস্তুপূজা ও হোমযজ্ঞ সম্পন্ন হলো। উপস্থিত ছিলেন ডাঃ হেডগেওয়ার স্মারক সমিতির সভাপতি ডঃ জয়ন্ত রায়চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক শশাঙ্কশেখর দে এবং সমিতির অন্যান্য পদাধিকারীগণ। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়। তিনি ভারতমাতা, ডাক্তারজী ও শ্রীগুরুজীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে পূজা ও হোমযজ্ঞে অংশগ্রহণ করার পর সকলের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। এক ফাঁকে স্বস্তিকা পত্রিকার সহ সম্পাদক সুকেশচন্দ্র মণ্ডল 'নতুন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাফল্যের ১০০ দিন' বিষয়ক স্বস্তিকা পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পত্রিকাটির ভূয়সী প্রসংসা করেন।

আনুষ্ঠানিক পর্বে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ-সরকার্যবাহ রামদত্ত চক্রধর, পূর্বক্ষেত্র সঙ্ঘচালক ডঃ জয়ন্ত রায়চৌধুরী, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক সারদাপ্রসাদ পাল, কলকাতা মহানগর সঙ্ঘচালক রমেশ সরাওগী। প্রথমে ভবন নির্মাণে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন সেই নির্মাণশিল্পীদের সংবর্ধনা জানানো হয়। মহানগর সঙ্ঘচালক দুই বছর ধরে ভবন নির্মাণের যে প্রক্রিয়া চলেছে সেই বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন। তিনি মনে করিয়ে দেন, ১৯৮৯ সালে ডাক্তারজীর জন্মশতবর্ষে কলকাতায় কেশব ভবনের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। আর সঙ্ঘের শতবর্ষে 'কেশব স্মৃতি' ভবনের নির্মাণ সেই ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতারই নতুন প্রকাশ। ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক ডঃ জয়ন্ত রায়চৌধুরী বলেন, দ্রুত বিকাশমান নিউটাউন-রাজারহাট-সল্টলেক এলাকা আগামীদিনের মহানগর জীবনের অন্যতম কেন্দ্র হতে চলেছে।



সঙ্ঘ ও সেবাকাজের ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণের কথা বিবেচনা করেই এই স্থান নির্বাচন করা হয়েছে। নতুন ভবনের নামকরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গে সঙ্ঘকার্যের অন্যতম অগ্রদূত কেশবরাও দীক্ষিতের কথা উল্লেখ করেন। ডাক্তারজীর সান্নিধ্যে গড়ে ওঠা এই নিবেদিতপ্রাণ কর্মযোগী সঙ্ঘ-প্রচারক ১৯৫০ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে সঙ্ঘের বিস্তার ও সংগঠন নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই এই নতুন ভবনের নাম রাখা হয়েছে 'কেশব স্মৃতি'।

সেবাকার্য পরিচালনার জন্য ভবনের গুরুত্বের বিষয়ে আলোকপাত করে সহ-সরকার্যবাহ রামদত্তজী বলেন, এই ভবন কেবল ইট-পাথরের স্থাপনা নয়, এটি কার্যকর্তাদের ত্যাগ, নিষ্ঠা ও অটল সংকল্পের প্রতীক। তিনি উল্লেখ করেন, কার্যপরিধির তুলনায় কেশব ভবন সীমিত হয়ে পড়েছে, তাই সময়ের প্রয়োজনে কলকাতার নতুন বিকাশকেন্দ্রে বৃহত্তর ও আধুনিক পরিকাঠামো সমৃদ্ধ কার্যালয় নির্মাণের প্রয়োজন পড়েছে। কেশব স্মৃতি ভবন আধুনিক গ্রন্থাগার, প্রশিক্ষণ ও বৈঠকের পরিকাঠামো, প্রচার-প্রসারের সুবিধা সহ সর্বভারতীয় স্তরের কার্যকর্তাদের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হবে। সমাজসেবা ও জনকল্যাণমূলক নানা কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্র হিসেবেও ভবনটিকে গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। মঞ্চ পরিচালনা করেন সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহ শশাঙ্কশেখর দে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কলকাতা মহানগর কার্যবাহ সুব্রত রায়। শেষে সকলেই সহভোজে মিলিত হন। ২৬ সেপ্টেম্বর কেশব স্মৃতি ভবনের আনুষ্ঠানিক দ্বারোদ্ঘাটন করেন সঙ্ঘের সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবলে।


DUROPLY®
70 Years of Excellence
Built on Craft, Sustained by Trust,
DRIVEN BY DESIGN
Marking 70 years of quality that lasts. DURO stands for integrity and real strength on every site. From solid foundations to the final finish, DURO is the name relied on for work that stands the test of time.
The Finest Friendly Company
Duroply Industries Limited
BLOCK BOARD | PLYWOOD | VENEERS | DOORS
Toll Free: 1800-345-3876 | Website: www.duroply.in
E-mail: corp@duroply.com



ভারতীয় সংগ্রহালয়ের আশুতোষ শতবার্ষিকী সভাগৃহে স্বস্তিকা পূজাসংখ্যার প্রকাশ অনুষ্ঠান

ডঃ অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ আশ্বিনের অলস অপরাহ্নে ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের আশুতোষ জন্মশতবার্ষিকী সভাগৃহের সভাগৃহে তখন ধূপের সুরভি আর আগমনী গানের স্নিগ্ধ সুর। ঢাকের চিরাচরিত কাঠি পড়ার আগেই যেন শহরের এই ঐতিহাসিক বেজে উঠল এক অন্য সুর— রাষ্ট্রপ্রেম, স্বাভিমান আর আপোশহীন সাহিত্যসাধনার এক নিরবচ্ছিন্ন মেলবন্ধন। ১৯৪৮ সালের শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীর পুণ্য তিথিতে যে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার অক্ষয় দীপশিখাটি প্রজ্বলিত হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের বুকে, সাত দশক পেরিয়ে আজও তা সমান স্বমহিমায় ভাস্বর। গত ৩ অক্টোবর শনিবার বিকেলে সেই ঐতিহ্যের এক নতুন স্বর্ণালি অধ্যায় লিখিত হলো জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক 'স্বস্তিকা'-র ১৪৩৩ বঙ্গাব্দের শারদীয়া পূজাসংখ্যা উন্মোচনের মধ্য দিয়ে।

সদ্য স্বাধীন হওয়া ভারতবর্ষের বুক জুড়ে তখন দেশভাগের চরম রক্তক্ষয়ী যন্ত্রণা; লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারা মানুষের হাহাকার আর রাষ্ট্রবিরোধী শক্তির আস্ফালন, ঠিক সেই রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতার সন্ধিক্ষণে জন্ম নিয়েছিল 'স্বস্তিকা'। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তৎকালীন সরকার্যবাহ একনাথজী রাণাডের সুদূরপ্রসারী নেতৃত্বে এবং একদল সংকল্পবদ্ধ দেশপ্রেমিক সাংবাদিক ও সাহিত্যিকের হাত ধরে যে পথচলা শুরু হয়েছিল, তা কোনোকালেই মসৃণ ছিল না। পরবর্তীকালে ইন্দিরা গান্ধীর আমলে জরুরি অবস্থার সেই অন্ধকার দিনগুলোতে বাক্‌স্বাধীনতা হরণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে গিয়ে বারবার নেমে এসেছে সরকারি রোষ। কিন্তু আত্মগোপন, অর্থনৈতিক সংকট কিংবা শাসকের চোখরাঙানি— কোনো কিছুই 'স্বস্তিকা'কে তার নির্ভীক ও নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশনার নীতি থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ১৯৫৩ সালের ২৩ জুন আত্মবলিদানের স্মৃতিকে অমর করে রাখতে ১৯৫৪ সাল থেকে প্রতি বছর প্রকাশিত হয়ে আসছে 'শ্যামাপ্রসাদ স্মরণ সংখ্যা'। জরুরি অবস্থা থেকে শুরু করে অনুপ্রবেশের সামাজিক বিপদ কিংবা শ্রীরামজন্মভূমি আন্দোলনের মতো জাতীয় জনজাগরণ— 'স্বস্তিকা' সমসাময়িক সমাজচিত্রের এক প্রামাণ্য দলিল হয়ে উঠেছে।

১৯৫১ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে 'স্বস্তিকা'র শারদীয়া পূজাসংখ্যা। বিগত সাড়ে সাত দশকে এই পূজাসংখ্যা কেবল একটি পত্রিকার বিশেষ সংস্করণ হয়ে থাকেনি, বরং পরিণত হয়েছে বঙ্গীয় সাহিত্য ও চিন্তাজগতের এক মহামিলনক্ষেত্রে। সাহিত্যদিশারি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, মনোজ বসু, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, ভবেন্দু ভট্টাচার্য থেকে শুরু করে পরবর্তীতে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, নবকুমার বসু বা কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের মতো দিকপাল কথা সাহিত্যিক

ও কবিরা নিজ প্রজ্ঞায় সমৃদ্ধ করেছেন এই পত্রিকার পৃষ্ঠা।

একইভাবে ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, পবিত্রকুমার ঘোষ, সন্তোষ কুমার ঘোষ, রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী, তথাগত রায়, সুজিত রায় কিংবা মোহিত রায়ের মতো প্রাবন্ধিকদের লেখনী জাতীয় জীবনের বিভিন্ন সংকট ও সমাধানকে বিশ্লেষণ করেছে। অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের আশ্রয় ও মুক্তচিন্তার অঙ্গন ছিল এই পত্রিকা। বিপিনচন্দ্র পালের কন্যা শোভনা নন্দী, বিপ্লবী পঞ্চানন চক্রবর্তী, কিংবা অনুশীলন সমিতিতে ডঃ হেডগেওয়ারের সহকর্মী বিপ্লবী ভূপতি মজুমদার ও ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর স্মৃতিলেখ 'স্বস্তিকা'র ঐতিহ্যকে দিয়েছে ঐতিহাসিক মর্যাদা।

এদিনের বর্ণাঢ্য উন্মোচন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বরিষ্ঠ সাংবাদিক সুজিত রায়। স্বাগত ভাষণ দেন 'স্বস্তিকা'র প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল এবং ভারতীয় সংগ্রহালয়ের অধিকর্তা ডঃ সায়ন ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করা হয়। শ্রীমতী সোমা চক্রবর্তী ও শ্রীমতী সুনীতা রায় কর্মকারের আগমনী গান এবং শ্রীমতী রীনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষ্যপাঠে এবং ভরত কুণ্ডুর কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতে সভাগৃহে এক দেশাত্মবোধক আবহ তৈরি হয়।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ জিষ্ণু বসু। পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারা পরিবারের সন্তান হিসেবে শৈশবের স্মৃতিরোমন্থন করে তিনি বলেন, 'আমার বাবা-মা তাড়া খাওয়া পশুর মতো পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন। আজ আমরা যে পশ্চিমবঙ্গে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে কথা বলছি, তার পেছনে একজন মানুষেরই অবদান— তিনি ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।' তিনি আরও উল্লেখ করেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর আন্তর্জাতিক সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার জন্য জমি হস্তান্তরের যে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা অনুপ্রবেশ রোধ ও জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় এক অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি, পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তাঁর তাৎপর্যপূর্ণ ভাষণে জাতীয়তাবোধ, প্রশাসনিক দর্শন এবং সামাজিক সংস্কার নিয়ে এক সুনির্দিষ্ট দিগ্‌দর্শন পেশ করেন। 'স্বস্তিকা'র সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের আত্মিক সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণের পর তাঁর সরকারের প্রথম ১০০ দিনের কাজের প্রথম পূর্ণাঙ্গ সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয়েছিল এই পত্রিকারই বিশেষ সংখ্যায়।

মুখ্যমন্ত্রী কড়া ভাষায় বলেন, 'আমাদের একমাত্র মন্ত্র হওয়া উচিত— নেশন ফার্স্ট বা রাষ্ট্র সর্বোপরি। এই পরিবর্তন কোনো নির্দিষ্ট আঞ্চলিক দল বা পরিবারের একক জয় নয়, এটি দেশপ্রেমিক সম্মিলিত শক্তির জয়।' তিনি বলেন, শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের জন্য বর্তমান সরকার একাধিক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

১. **শিক্ষা ও ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবন :** রাজ্যের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে পূর্ণাঙ্গ 'বন্দে মাতরম্' প্রার্থনা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ২০ জুন তারিখটিকে 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, যা অতীতে রাজনৈতিক কারণে আড়াল করার চেষ্টা হয়েছিল।

১. **পাঠ্যক্রম ও ইতিহাসের সত্য প্রকাশ :** মাতঙ্গিনী হাজরা, বীর বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু এবং বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের ইতিহাস সঠিক নিরপেক্ষতায় তুলে ধরতে নতুন সিলেবাস কমিটি গঠিত হয়েছে।

৩. **নামকরণ সংস্কার :** ঔপনিবেশিক কিংবা অত্যাচারী বিদেশি



ফঃ ৪

শাসকদের নামে থাকা রাস্তা ও স্থানসমূহের নাম পরিবর্তন করে ভারতীয় মনীষী ও বিপ্লবীদের নামে নামকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

৪. **সংস্কৃতি রক্ষা :** সাধু-সন্ত ও জাতীয় প্রতীকের অবমাননা বরদাস্ত করা হবে না জানিয়ে তিনি তরুণ প্রজন্মকে ভারতীয় সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রবাদী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

বক্তব্যের শেষে মুখ্যমন্ত্রী 'স্বস্তিকা'কে অনুরোধ জানান, আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের পুনর্নির্মাণ ও ভবিষ্যৎ রূপরেখা নিয়ে একটি দীর্ঘ ৫-৬ ঘণ্টার আলোচনা সভা আয়োজন করতে, যেখানে সরকার ও সচেতন নাগরিকরা গঠনমূলক মতামত বিনিময় করতে পারবেন। 'স্বস্তিকা' প্রকাশনার সৃজন প্রযুক্তিতে দীর্ঘকালীন সহযোগী অজিত ভকতকে সংবর্ধিত করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেইসঙ্গে সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকাকে দৈনিক সংবাদপত্রের দিশায় এগিয়ে যাওয়ার ইচ্ছাও ব্যক্ত করেন তিনি।

অনুষ্ঠানের মাঝে সঙ্গীতশিল্পী কল্যাণ ভট্টাচার্যের কণ্ঠে 'একবার বিরাজ গো মা হৃদি কমলাসনে' গানটি সভাগৃহের আবহকে এক গভীর ভাবাবেগে উজ্জীবিত করে। মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন স্বস্তিকা



স্বস্তিকার প্রচ্ছদ রূপকার অজিত কুমার ভকতকে মুখ্যমন্ত্রীর সম্মাননা জ্ঞাপন

পত্রিকার সম্পাদক ডঃ তিলক রঞ্জন বেরা, শুভস্বস্তিকা প্রিন্ট ফাউন্ডেশনের ডাইরেক্টর অজয় গোয়েল, অরিন্দম সিংহ রায়, বিধায়ক অজিত জানা এবং বিশিষ্ট আইনজীবী সৌরভ ঘোষ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বস্তিকার পূর্বতন সম্পাদক ডঃ বিজয় আঢ্য, বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ, মন্ত্রী তাপস রায় ও ডঃ কল্যাণ চক্রবর্তী, আইনজীবী অজয় নন্দী, প্রবীণ সাংবাদিক রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতের অগণিত বিশিষ্টজন। পুরো অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন স্বস্তিকা পত্রিকার সহ-সম্পাদক সুকেশচন্দ্র মণ্ডল। সমবেত কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম্' ও জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘটে।

আশুতোষ জন্মশতবার্ষিকী সভাগৃহের সিঁড়ি দিয়ে যখন উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী ধীরে ধীরে রাজপথে নেমে আসছেন, তাঁদের প্রত্যেকের হাতে শোভা পাচ্ছে 'স্বস্তিকা'র সদ্য প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যা। শরতের হিমেল বাতাসে তখন মা দুর্গার আগমনীর সুরের পাশাপাশি যেন মিশে আছে সাত দশকের এক অদম্য লড়াইয়ের অনুভূতি— যে লড়াই সত্যের, যে লড়াই স্বাভিমানের, যে লড়াই রাষ্ট্রভাবনার।



মালদহের ভুতনিতে বন্যাত্রাণে স্বয়ংসেবকদের সেবাকাজ

মালদহ জেলার মানিকচক ব্লকের ভুতনিতে যে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, তাতে রাজ্য সরকার অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে বন্যা মোকাবিলার কাজ করে চলেছে। পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরাও বন্যাকবলিত মানুষের প্রতি সেবার হাত বাড়িয়ে দিয়ে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের নেতৃত্বে গৌড় সংস্কৃতি উত্থান ট্রাস্টের মাধ্যমে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ৭জন চিকিৎসকের একটি দল ভুতনিতে পৌঁছে বন্যাপীড়িত মানুষদের চিকিৎসা করেন। অন্যদিকে স্বয়ংসেবকরা শিশুখাদ্য, ব্লিচিং পাউডার ও মশারি বিতরণ করেন।

Today's Choice.....
Vandana
SAREES • SUITS • BEDSHEETS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidory Sarees & Bedsheets (Always Exclusive)
Cont. No. 033-2270 0476, 9432290475

SURYA

Shaping Structures That Shape Tomorrow

Steel is what turns plans into lasting structures. Surya provides high-quality steel solutions that support construction, infrastructure, and development. Engineered for strength and consistency, they help projects move forward with confidence.

Because the future is built on what holds firm today.



SURYA HAI TOH BHAROSA HAI

Lighting | Wires and Cables | Professional Lighting | Fans | Appliances | Water Pumps | PVC and Water Tanks | Steel Pipes



I am SURYA | 50 YEARS OF TRUST | DURABLE PRODUCTS | ASSURED QUALITY

SURYA ROSHNI LIMITED | consumercare@surya.in | www.surya.co.in

TOLL FREE 1800 102 5657

With Best Compliments
from :

PAHARPUR COOLING TOWERS LTD.



PAHARPUR HOUSE

8/1/B, Diamond Harbour Road

Kolkata - 700 027, India

www.paharpur.com

CIN : U02005WB1949PLC018363

Ph. +91-33-4013 3000

Dir. +91-33-4013 3403

Fax : +91-33-4013 3499

vswarup@paharpur.com

ভূত চতুর্দশী তথা রূপ চতুর্দশী
আলো, বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের মেলবন্ধন

সাগরিকা ভট্টাচার্য

দীপাবলী বা দেওয়ালি ভারতীয় সংস্কৃতির একটি অত্যন্ত ঐতিহ্যবাহী ও চোখধাঁধানো পাঁচ দিনব্যাপী উৎসব। অশুভ শক্তি অন্ধকারকে পেছনে ফেলে শুভ ও আলোর জয়ের বার্তা নিয়ে আসে এই মহোৎসব। সনাতন পঞ্জিকা ও শাস্ত্রানুসারে দীপাবলীর এই পাঁচ দিনের আয়োজনটি একটি চমৎকার পরম্পরায় বাঁধা :

প্রথম দিন (ধনত্রয়োদশী) : কার্তিক মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যের কামনায় সোনা, রুপা বা নতুন বাসনপত্র কেনা হয় এবং মা লক্ষ্মীর আরাধনা করা হয়।

দ্বিতীয় দিন (নরক চতুর্দশী/ভূত চতুর্দশী/ছোট দীপাবলী) : শ্রীকৃষ্ণ ও সত্যভামা কর্তৃক নরকাসুর বধ এবং ১৪টি প্রদীপ জ্বালিয়ে অশুভ শক্তিকে দূরে রাখার বিশেষ দিন।

তৃতীয় দিন (মূল দীপাবলী ও মহালক্ষ্মী পূজা) : উৎসবের মূল আড়ম্বর। অমাবস্যার সন্ধ্যায় ঘরে ঘরে প্রদীপের দীর্ঘ প্রদীপমালা জ্বালানো হয়, মহালক্ষ্মীপূজা ও আতশবাজির আলোয় ধরণী আলোকিত হয় ও গভীর রাতে মহাকালী পূজার আরাধনা।

চতুর্থ দিন (গোবর্ধন পূজা/বলিপূজা) : ভগবান শ্রীকৃষ্ণের গোবর্ধন পর্বত ধারণের স্মৃতিতে এই দিনে গো-সেবা ও অন্নকূট উৎসব পালিত হয়।

পঞ্চম দিন (ভাইফোঁটা/ভ্রাতৃদ্বিতীয়া) : কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে বোনেরা ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিয়ে তার দীর্ঘায়ু ও মঙ্গল কামনার মাধ্যমে এই পঞ্চদিনের উৎসবের সমাপ্তি ঘটায়।

এই পাঁচ দিনের উৎসবের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা দ্বিতীয় দিনটি অর্থাৎ কার্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিটি বঙ্গ সংস্কৃতি তথা ভারতীয় সনাতন ঐতিহ্যে এক বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। আমাদের কাছে যা 'ভূত চতুর্দশী', তাই-ই আবার দেশের বিভিন্ন প্রান্তে 'রূপ চতুর্দশী', 'যম চতুর্দশী' কিংবা 'ছোট দীপাবলী' বা 'নরক চতুর্দশী' নামে পরিচিত। আলো ও অন্ধকারের এই সন্ধিক্ষণে জড়িয়ে আছে বহু পৌরাণিক গাথা, লোকবিশ্বাস এবং বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য।



'নরক চতুর্দশী' ও 'যম চতুর্দশী'র পৌরাণিক প্রেক্ষাপট : দ্বাপর যুগে এই বিশেষ তিথিতেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর পত্নী সত্যভামা যৌথভাবে অত্যাচারী নরকাসুরকে বধ করেন এবং তাঁর বন্দিশালা থেকে ১৬ হাজার নারীকে মুক্ত করেন। অসুর বধের এই আনন্দ ও মুক্তির প্রতীক হিসেবে দিনটি 'নরক চতুর্দশী' নামে প্রসিদ্ধ।

অন্যদিকে, এই দিনে মৃত্যু ও ধর্মের দেবতা যমরাজের উদ্দেশে ১৪টি প্রদীপ অর্পণ করার রীতি রয়েছে। পদ্মপুরাণ ও হিন্দু শাস্ত্রানুসারে যে চোদ্দজন যমের উদ্দেশে প্রদীপ উৎসর্গ করা হয়, তাঁরা হলেন— ধর্মরাজ, মৃত্যু, অন্তক, সর্বভূতক্ষয়, বৃকোদর, বৈবস্বত, ঔডুম্বর, কাল, যম, দধ্ন, পরমেষ্ঠী, নীল, চিত্র ও চিত্রগুপ্ত।

প্রদীপের সংখ্যা ১৪ হওয়ার কারণ : এই ১৪ সংখ্যারও রয়েছে বিশেষ ধর্মীয় তাৎপর্য। যেমন—

১. **১৪ পুরুষকে প্রদীপ :** এই দিনে ১৪ জন পূর্বপুরুষের উদ্দেশে ১৪টি প্রদীপ প্রজ্বলন করা হয়— পিতৃকুলের পূর্ববর্তী সাত পুরুষ এবং মাতৃকুলের পূর্ববর্তী সাত পুরুষ, অর্থাৎ মোট চোদ্দ পুরুষের উদ্দেশে এই প্রদীপ নিবেদন করা হয়। কৃষ্ণা চতুর্দশীর ঘন অন্ধকারে মৃত পূর্বপুরুষদের পথ দেখাতে ও স্মরণ করতেই এই দীপ প্রজ্বলন করা হয়।

২. **১৪টি ভুবন প্রদীপ :** হিন্দু পুরাণ অনুসারে, মহাবিশ্বকে চোদ্দটি ভুবন বা লোকে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে সপ্ত ঊর্ধ্বলোকে (উপরের সাতটি লোক) এবং সপ্ত পাতাল (নীচের সাতটি পাতাল লোক) রয়েছে। নীচে এদের নাম দেওয়া হলো :

সপ্ত ঊর্ধ্বলোক (উপরের সাতটি লোক)

১. ভূলোক (পৃথিবী— যেখানে মানুষের বাস)।
২. ভূবর্লোক (সূর্য ও ধ্রুবতারার মধ্যবর্তী স্থান বা আকাশ)।
৩. স্বর্গলোক (দেবরাজ ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতাদের আবাস)।
৪. মহর্লোক (মহর্ষি ও তপস্বী ঋষিদের বাসভূমি)।
৫. জনলোক (ব্রহ্মার মানসপুত্রদের আবাস)।
৬. তপোলোক (তপস্যারত ব্রহ্মচারী ও দেবতাদের আবাস)।
৭. সত্যলোক (বা ব্রহ্মলোক— সর্বোচ্চ লোক, যেখানে স্বয়ং ব্রহ্মা বাস করেন)।

পৃথিবীর নীচে অবস্থিত সাতটি পাতাললোকের নাম :

১. অতল (বল নামক অসুর এখানে বাস করেন)।

২. বিতল (মহাদেব শিব 'হর-ভাব' বা হটকেশ্বর রূপে এখানে অবস্থান করেন)।

৩. সুতল (ধার্মিক অসুররাজ বলি এখানে বাস করেন এবং ভগবান বিষ্ণু বামন রূপে তাঁর দ্বাররক্ষক)।

৪. তলাতল (দানব স্থাপত্যশিল্পী ময় দানবের রাজ্য। একে অনেক সময় রাক্ষসলোকও বলা হয়)।

৫. মহাতল (কদ্রুর সন্তান বহুফণা বিশিষ্ট নাগদের আবাসভূমি)।

৬. রসাতল (দিতি ও দনুর বংশধর দানব ও দৈত্যদের আবাস)।

৭. পাতাল (নাগলোক—সর্বনিম্ন পাতাল, নাগরাজ বাসুকি এখানে শাসন করেন এবং মণির আলোয় এই পাতাল লোক আলোকিত থাকে)।

৩. **১৪ জন যম :** পদ্মপুরাণ ও হিন্দু শাস্ত্রমতে ভূত চতুর্দশী বা নরক চতুর্দশীতে যে চোদ্দজন যমের বা যমরাজের নামের উদ্দেশে (কিংবা চোদ্দ পুরুষের উদ্দেশ্যে) প্রদীপ দেওয়া হয়।

৪. **শ্রীরামের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন :** রামায়ণের ঘটনা অনুযায়ী, রাবণ বধের পর এই বিশেষ চতুর্দশী তিথিতেই প্রভু শ্রীরামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণকে নিয়ে তাঁর ১৪ বছরের দীর্ঘ বনবাস শেষ করে অযোধ্যায় ফিরে এসেছিলেন। সেই দিনটি ছিল অত্যন্ত অন্ধকার (অমাবস্যার আগের রাত)। দীর্ঘ ১৪ বছর পর তাঁদের প্রিয় রাজপুত্রের ফিরে আসার আনন্দে এবং শ্রীরামকে স্বাগত জানাতে সমগ্র অযোধ্যাবাসী আনন্দের জোয়ারে ভেসে যান। তাঁরা শ্রীরামের বনবাসের ১৪টি বছরের প্রতীক হিসেবে এবং অন্ধকারের বুক চিরে আলোর বার্তা আনতে পুরো অযোধ্যা নগরী ১৪টি বৃহৎ প্রদীপ তার সঙ্গে আরও অসংখ্য প্রদীপ জ্বালিয়ে আলোয় আলোকময় করে তুলেছিলেন। এই আনন্দ উৎসবের ধারা বজায় রেখেই পরবর্তী অমাবস্যায় দীপাবলি পালন করা হয়।

ছোট দীপাবলী কেন বলে?

অনেকেরই ধারণা, মূল দীপাবলীর ঠিক আগের দিনটি উদযাপিত হয় বলেই এর লোকপ্রিয় নাম 'ছোট দীপাবলী'। তবে এই নামকরণের নেপথ্যে লুকিয়ে রয়েছে ব্যাকরণ ও প্রথার এক অপূর্ব মেলবন্ধন। 'দীপাবলী' শব্দটির উৎস সন্ধানে গেলে দেখা যায়, এটি গঠিত হয়েছে 'দীপ' (যার অর্থ প্রদীপ বা আলো) এবং 'আবলী' (যার অর্থ সারি বা শৃঙ্খলা)— এই দুইয়ের সমন্বয়ে, অর্থাৎ প্রদীপের অনুক্রমিক সারি। দীপাবলীর পুণ্য সন্ধ্যায় যেমন চতুর্দিকে আলোর সুবিশাল ও দীর্ঘ শৃঙ্খল সাজিয়ে তোলা হয়, ঠিক তেমনই তার পূর্ববর্তী চতুর্দশী তিথির সন্ধ্যায় জ্বালিয়ে তোল হয় ১৪টি প্রদীপের এক পরিমিত সারি। অমাবস্যার রাতে প্রদীপের সেই প্রথাগত সারিটি ধারণ করে এক মহিমাময় ও সুদীর্ঘ রূপ— কারণ প্রাচীনকাল থেকেই দীপাবলীর সন্ধ্যায় ১০৮টি দীপ জ্বালানোর ঐতিহ্য বহুল প্রচলিত। অন্যদিকে, চতুর্দশীর সাঁঝে প্রজ্বলিত প্রদীপের সারিটি সীমাবদ্ধ থাকে ঠিক ১৪টির সংখ্যায়। আলোর এই সারির আকারের তারতম্য এবং প্রদীপের সংখ্যার এই বৈষম্যের কারণেই লোকমুখে চতুর্দশীর প্রদীপমালার রূপটি 'ছোট দীপাবলী' নামে পরিগণিত হয়ে আসছে)।

প্রদীপ প্রজ্বলনের স্থান ও রহস্য

শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী— 'দেবগৃহাদৌ চতুর্দশ দীপদানম্' অর্থাৎ দেবগৃহে বা ঠাকুরঘরে প্রদীপ অর্পণ করার কথা বলা হলেও, লোক সংস্কৃতির টানে প্রদীপের স্থান ছড়িয়ে পড়েছে গৃহের নানা কোণে :

১. ঠাকুরঘর, ২. রান্নঘর, ৩. তুলসীমঞ্চ, ৪. মূল প্রবেশদ্বার, ৫. ছাদ, ৬. বারান্দা, ৭. উঠোন, ৮. পুকুরপাড় ও ৯. শৌচাগারের প্রবেশদ্বার।

গৃহের প্রতিটি কোণে আলোর কারণ :

লোকবিশ্বাস বলে, প্রতি বছর এই বিশেষ দিনে ইহলোক ও পরলোকের সূক্ষ্ম প্রাচীর কিছু সময়ের জন্য উন্মুক্ত হয়। ফলে পিতৃপুরুষের পাশাপাশি কিছু অতৃপ্ত বা অশুভ আত্মাও মর্ত্যে বিচরণ করে। গৃহের প্রতিটি অন্ধকার কোণে আলো জ্বালিয়ে সেই অশুভ শক্তিকে দূরে রাখার চেষ্টা করা হয়।

প্রদীপ প্রজ্বলনের আগে উচ্চারণ করা হয় বিশেষ মন্ত্র :

'নমঃ পিতৃভ্যঃ প্রেতেভ্যো নমঃ ধর্ম্মায় বিষ্ণবে।
নমঃ ধূম্রায় রুদ্রায় কান্তারপতয় নমঃ।।'

(অর্থ : পিতৃগণ ও প্রেতগণের প্রতি নমস্কার। ধর্ম, বিষ্ণু, রুদ্র এবং অরণ্য বা কান্তারের অধিপতির প্রতি নমস্কার।)

১৪ শাক ভক্ষণ ও ঋতুসন্ধির বিজ্ঞান

ভূত চতুর্দশীর দুপুরে ১৪ রকম শাক খাওয়ার নিয়ম কেবল একটি সামাজিক রীতিনীতি নয়, এর পেছনে রয়েছে প্রখর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি।

১৪টি শাক হলো : ওল, নটে, বেথুয়া, সরষে, কালকাসুন্দে, জয়ন্তী, নিম, হেলেঞ্চা, সজনে, পলতা, গুলঞ্চ, ভাটপাতা, শুষনি ও শুলফ।

কার্তিক মাস হলো শরৎ ও শীতের সন্ধিক্ষণ। এই সময় আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে শীরের নানাবিধ সংক্রামক রোগব্যাধি বাসা বাঁধার ঝুঁকি বাড়ে। ঐতিহ্যবাহী এই ১৪ শাকের ভেষজ গুণাগুণ শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে।

অশুভ শক্তি ও ব্যাধি দূরীকরণে শাকের ভূমিকা :

ভূত চতুর্দশীর দিন ১৪ শাক কেবল গ্রহণ করাই নয়, শাক ধোয়া পবিত্র জল গৃহের প্রতিটি কোণে ও প্রাঙ্গণে ছিটিয়ে দেওয়ার একটি প্রাচীন লোকাচার প্রচলিত রয়েছে। বঙ্গীয় লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, এই ভেষজগুণসম্পন্ন জল ঘরের নেতিবাচক ও অশুভ শক্তিকে বিতাড়িত করে চারপাশে এক কল্যাণময় পরিবেশ গড়ে তোলে। ঋতুপরিবর্তনের এই সূচনাকালে গৃহ প্রাঙ্গণকে জীবাণুমুক্ত ও শুদ্ধ রাখার পেছনে আমাদের পূর্বপুরুষদের এই নিভৃত প্রয়াসটি ছিল সত্যিই প্রশংসনীয়।

রূপ চতুর্দশী : সৌন্দর্যের ভেষজ সংস্কার

এবার আসা যাক এই দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিতে। এই তিথির সঙ্গে যেমন জড়িয়ে আছে পিতৃপুরুষ ও অতৃপ্ত আত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবদনের প্রাচীন রীতি, তেমনই বঙ্গের লোকাচার ও শাস্ত্রাচারে এই দিনটির আর একটি বিশেষ পরিচয় রয়েছে— 'রূপ চতুর্দশী' বা 'রূপ চৌদাস'।

এই তিথিতে সূর্যোদয়ের আগে সরষের তেল, হলুদ, দুধের সর এবং নানা ভেষজ উপাদানের সমন্বয়ে তৈরি 'উবটান' (স্নান করার বিশেষ মিশ্রণ) মেখে স্নান করার রীতি রয়েছে। ঋতু পরিবর্তনের সময়ে ত্বকের যত্ন নেওয়া ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল রূপ ধরে রাখাই এর মূল উদ্দেশ্য, যার কারণে এই দিনটির অপর নাম 'রূপ চতুর্দশী'।

অন্ধকারের বুকে আলোর প্রলেপ

ভূত চতুর্দশী বা রূপ চতুর্দশী কেবল প্রাচীন কালপঞ্জির কোনো তিথিমাত্র নয়; এটি হলো আলো ও অন্ধকারের সূক্ষ্ম সীমানায় দাঁড়িয়ে জীবনের সত্যকে উদ্‌যাপনের এক মহোৎসব। ১৪টি প্রদীপের শিখা যেমন পিতৃপুরুষ ও ১৪ ভুবনের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার বার্তা পৌঁছে দেয়, তেমনই ১৪ শাকের ভেষজ গুণ আমাদের সুস্থ ও সচেতন জীবনের পথ দেখায়। প্রকৃতির বৈজ্ঞানিক সত্য ও লোকবিশ্বাসের চমৎকার মেলবন্ধনে ঘেরা এই দিনটি আমাদের মনে করিয়ে দেয়— বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সমস্ত অশুভ শক্তি ও অন্ধকারকে জয় করে শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয় আলোর দ্যুতি, সৌন্দর্য ও রূপের স্নিগ্ধতা। □

ভারতের এক গুপ্ত সাধিকার কথা

মাতঙ্গী মাঈ

রণজয় বিশ্বাস

বাংলা ১৩২৩ সালের গ্রীষ্মের এক প্রসন্ন প্রভাত। বিশ বছর বয়স্কা সাধিকা মাতঙ্গী বীরভূম জেলার তারাপীঠে এলেন। দীর্ঘ একবছর ধরে বিভিন্ন সতীপীঠ পরিভ্রমণে বের হয়ে সুদূর পঞ্জাবের জ্বালামুখী থেকে ঘুরতে ঘুরতে কলকাতায় মহাতীর্থ কালীঘাট সতীপীঠ দর্শন করে সিদ্ধপীঠ তারাপীঠে পৌঁছলেন। এই মহাপবিত্র ও সদাজাগ্রত পীঠস্থানে কয়েকদিন নিভৃতে সাধনা করেন মাতঙ্গীদেবী। মহাশ্মশানে মহানিশায় মাতঙ্গীদেবী সাধনা ক্রিয়াসম্পন্ন করেন। মাতঙ্গী মাঈ যোগ ও তন্ত্র উভয় পথেই দক্ষ হয়েছেন। সাধিকা মাতঙ্গীদেবী তারাপীঠে আসবার পাঁচ বছর আগে বামদেব স্থূলদেহে অপ্রকট হয়েছেন। বামদেবের বিরহে তারাপীঠ সম্পূর্ণ বিষাদময়। যন্ত্রের মতো কাজকর্ম, জপ, ধ্যান, যাগযজ্ঞ সবই চলছে কিন্তু তাতে প্রাণ নেই, আনন্দও নেই, শান্তিও নেই। তারাপীঠের আকাশ ও বাতাস তাই প্রাণহীন, নিরানন্দে পরিপূর্ণ। যদিও বামদেব আর সশরীরে নেই। তবুও তিনি সূক্ষ্ম শরীরে সর্বদা বিরাজ করছেন এবং তাঁর নিত্যলীলা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু তাঁর এই জ্যোতির্ময় রূপ দর্শন করা সবার পক্ষে সম্ভব নয় কেবলমাত্র উচ্চকোটির সাধকগণই তাঁকে দর্শন ও উপলব্ধি করতে পারেন তাও স্বয়ং বামদেবের কৃপাসাপেক্ষে।

তারাপীঠের ওপর দিয়ে বামদেবের সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের বেশি অফুরন্ত প্রাণবন্ত মহালীলা বয়ে গেছে, সেই আনন্দময় অমৃতময় পরম শান্তিময় সুখস্মৃতি স্মরণ করে তারাপীঠের জীবজগৎ আজ বিরহে, বেদনায় উদ্বেলিত। শ্রীবাম বিরহে তারাপীঠ কাঁদছে নীরবে নিভৃতে।

তারাপীঠের দিনমণি, তারাপীঠের প্রাণপুরুষ শ্রীশ্রী ব্যামাক্ষ্যাপার অফুরন্ত অধ্যায়ের সৌর আলোয় যে তারাপীঠ আলোময় প্রাণময় হয়ে থাকতো সর্বদা, সেই তারাপীঠে সূর্যের অস্তাচলের পর আঁধার ভরা তারাপীঠে প্রকাশিত হলো সাধক তারার দল। কিন্তু তারা সবাই মিলেও তারাপীঠের এই অন্তহীন অন্ধকার বিন্দুমাত্র দূর করতে পারলেন না। ব্রহ্মময়ী তারামায়ের কৃপাধন্যা ও দেবদেহধারী শ্রীবামের আশিসধন্যা এই উন্নত সাধিকা মাতঙ্গীদেবী গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারলেন এবং প্রত্যক্ষ করলেন যে সদ্য লীলা সমাপ্ত বামদেবের অন্তহীন লীলার মধুর সূক্ষ্ম রেশ তারাপীঠের আকাশ-বাতাস, জলে- স্থলে, বৃক্ষ-তরুলতায় সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। যে সাধক, সাধিকা যত খুশি পারে তা গ্রহণ করে নিজ সাধন শক্তিকে ঐশ্বর্যবান করতে পারেন।

বামদেবের এই অনন্ত করুণাধারা ফুরোবে না কিন্তু এমনি তারাবামের বিচিত্র লীলা যে তা প্রত্যক্ষ করতে বা গ্রহণ করতে খুব কম সাধকই পারেন। মাতঙ্গীদেবী তা পারলেন এবং প্রাণভরে গ্রহণ করলেন। মাতঙ্গীদেবী যখন তারাপীঠে আসেন তখন তারাপীঠে সাধনরত রয়েছেন পঞ্চানন মিশ্র, দয়ানন্দ সরস্বতী, চক্রবর্তীবাবা, ললিত গোঁসাই, কালিকানন্দ ব্রহ্মচারী, মহাদেব গিরি, প্রহ্লাদ গিরি, ইটে গোঁসাই, চটক বাবাজী প্রমুখ সাধক। বেশ কয়েক জনের সঙ্গে মাতঙ্গী মাঈর আলাপ পরিচয় হলো, বিশ বছর বয়স্কা এই সাধিকার সাধনার প্রতি কারোর শ্রদ্ধা দেখা গেল না। কারোর-বা অতি উৎসাহ দেখা গেল। কেউ-বা উদাসীন হয়ে রইলেন। কিন্তু অসামান্য শক্তির অধিকারী ও নবীনা সাধিকা এসব অগ্রাহ্য করে নিজ সাধন ও তন্ত্রক্রিয়াকর্মে মগ্ন হয়ে রইলেন। যথাসময়ে পরম আনন্দে তারামায়ের কৃপালাভ করে মাতঙ্গী মাঈ তারামাকে প্রণাম করে ও বামদেবের উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করে তারাপীঠ থেকে বিদায় নিয়ে অসমের কামাখ্যাপীঠের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। মাতঙ্গীদেবীর জন্ম বাংলা ১৩০৩ সালে (ইং-১৮৯৬) প্রয়াগের এক প্রবাসী বাঙ্গালি ব্রাহ্মণ পরিবারে। তাঁর পিতা অত্যন্ত সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। ছোটোবেলায় মাতঙ্গীমাঈর মাতৃবিয়োগ হয়, আর মাত্র ১৬ বছর বয়সে পিতৃবিয়োগ ঘটে। মাতঙ্গীমাঈর জীবনের উদ্দেশ্য ছিল ঈশ্বর লাভ। তাই তিনি সাধন জীবনকেই মনে প্রাণে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করলেন। এরপর মাতঙ্গীদেবী একা সুদূর পঞ্জাবের জ্বালামুখীর উদ্দেশে রওনা হলেন। পঞ্জাবের জ্বালামুখীর নিকট সিদ্ধ মহাপুরুষ মার্তণ্ডদেবের আশ্রম। মার্তণ্ডদেবের ঐশীকৃপায় যথাসময়ে মাতঙ্গীদেবী মার্তণ্ডদেবের আশ্রমে উপস্থিত হলেন। প্রবীণ ও প্রাজ্ঞ সিদ্ধপুরুষ মার্তণ্ডদেব তাঁকে দীক্ষা দান করেন, এরপর যোগ ও তন্ত্র এই উভয় পথেই তাঁর কঠোর সাধনা শুরু হয়। যথাসময়ে তাঁর সন্ন্যাস জীবনের নাম হলো মাতঙ্গীদেবী।

প্রথম পর্যায়ে তিনি তিন বছর জ্বালামুখীর কাছে গুরু মার্তণ্ডদেব মহারাজের আশ্রমে তাঁর নির্দেশে সাধনা করেন। এই সাধনায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর গুরু মার্তণ্ডদেবের নির্দেশে ১৩২৩ সালে বিশ বছর বয়সে একা ভারতবর্ষের সকল পীঠ পরিব্রাজনার জন্য মাতঙ্গীদেবী রওনা হলেন। মাতঙ্গী মাঈয়ের একমাত্র সম্বল গুরুকৃপা। গুরুকৃপাকে সম্বল করে তিনি পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণ করতে থাকেন সতীপীঠ দর্শন করতে করতে। দীর্ঘ এক বছর ধরে ভারতবর্ষ জুড়ে ছড়ানো সব সতীপীঠ দর্শন করলেন। গুরু মার্তণ্ড মহারাজ তাঁর স্নেহের শিষ্যার যাত্রাকালে শিষ্যার চিমটিটিকে মন্ত্রপূত করে দেন এবং বলেন যখন বিপদ আসবে এই মন্ত্র স্মরণ করলেই চিমটে থেকে ভয়ঙ্কর অগ্নিশিখা বের হয়ে সেই আক্রমণকারী শত্রুকে পুড়িয়ে দেবে। গুরুর এই মহাশক্তি দীর্ঘ এক বছর ধরে মাতঙ্গী মাঈকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করেছে।

মহাপীঠ তারাপীঠে আসার আগে মাতঙ্গীমাঈ যখন কলকাতার কালীঘাটে কয়েক দিনের জন্য কালীগঙ্গার তীরে একটি জীর্ণ গৃহে অবস্থান করছিলেন তখন একরাত্রে এক কুখ্যাত দুর্বৃত্ত কামার্ত অবস্থায় মাতঙ্গীদেবীকে আক্রমণ করতে এলে মাতঙ্গীমাঈর চিমটে থেকে ভীষণ অগ্নিশিখা বেরিয়ে এসে সেই নরপশুর সর্বাঙ্গ পুড়িয়ে দেয়। তারপর তার পূর্বজন্মের কৃত কর্মফল মাতঙ্গীমাঈ খণ্ডন করে তাকে ক্ষমা করে দেন। তারপর মাতঙ্গীমাঈ তারাপীঠ থেকে কামাখ্যা হয়ে জ্বালামুখীতে ফিরে আসেন, তার গুরুদেব তাকে কাঙ্গড়ার বিখ্যাত ত্রিপুর মালিনী পবিত্র পীঠে প্রেরণ করেন, সেইখানে চোদ্দ বছর একটানা শিবের কঠোর রূপের তপস্যা করে ভারতবর্ষের বিখ্যাত শৈব সাধিকা হিসেবে পঞ্জাব ও হিমাচলপ্রদেশে সর্বসাধারণের মধ্যে পরিগণিত হন। মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে বাংলা ১৩৪৩ সালে এই মহাসাধিকা সিদ্ধলোকে গমন করেন। আজও তাঁর নাম পাকিস্তানের পঞ্জাব প্রদেশে এবং সিন্ধুপ্রদেশে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়।

(লেখক কলকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী)



দীপাবলী ও শ্যামামায়ের আরাধনা

মৌ চৌধুরী

কথায় বলে বাঙ্গালির বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগেই আছে। তবে প্রতিটি পার্বণ অর্থাৎ পূজা-আরাধনা ও উৎসবের পৃথক মাহাত্ম্য আছে। কিন্তু দীপাবলী সমস্ত স্তরের সনাতনীর কাছে বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। এই আরাধনা উৎসব কোনো এলাকায় নির্দিষ্ট নয়, গোটা দেশেই সম মর্যাদায় ও আনন্দের সঙ্গে পালিত হয়। রামায়ণে উল্লেখ রয়েছে এই দিনে শ্রীরামচন্দ্র— দেবী সীতা, ভাই লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে রাবণ বধ ও পিতৃসত্য পালন পূর্ণ করে চোদ্দ বছর বনবাস কাটিয়ে অযোধ্যায় ফিরেছিলেন। সেদিন অযোধ্যাবাসী অমানিশা রাতে প্রতিটি ঘরে দীপ প্রজ্বলন করে বরণ করেছিলেন। দীপাবলীর রাতে আলোর উৎসবে নিজেকে সমর্পিত করে সমস্ত অন্ধকার ও অশুভ শক্তিকে বিনাশের মাধ্যমে সুখ শান্তি সমৃদ্ধি প্রার্থনা করে মানব হৃদয় হয়ে ওঠে পরিপূর্ণ।

বঙ্গজীবনেও এই দিনটি উৎসব হিসেবেই পালিত হয়। পূজা ভক্তি, শ্রদ্ধা মিলন ও আনন্দের অনুষ্ঠান দুর্গাপূজা ও ঘরের লক্ষ্মীপূজা শেষ হওয়ার আগে থেকেই প্রস্তুতি শুরু হয় শ্যামামায়ের আরাধনা এবং দীপাবলী উৎসবের। জায়গা ও ক্ষেত্র বিশেষে এই দিন অনেকেই গৃহে লক্ষ্মীদেবীর আরাধনাও করেন। ঋষি যোগীরা এই দিনটি ভক্তিপূর্ণ মনে আত্মশুদ্ধি পালনের উপদেশ প্রদান করেন। সনাতনীদের কাছে পারস্পরিক প্রীতি ও উপহার বিনিময়ের শ্রেষ্ঠ সময় হিসেবে 'দীপাবলী'কে অনেকেই বিবেচনা করেন। বাঙ্গালি সনাতনীদের কাছে দেশাচার ভেদে ভূত চতুর্দশী পালিত হয়। তবে বিভিন্ন রকমের মিশ্রিত শাক রান্না করা হয় আয়ুর্বেদীয় শাস্ত্র অনুসারেই। দীপাবলী কেবল মাত্র আনন্দময় লোকাচারই নয়, পাশাপাশি পরিবেশ উন্নত রাখতে সহায়তা করে। বর্ষায় জলাজমি ও গজিয়ে ওঠা আগাছায় বহু কীটপতঙ্গ জন্মায়। দীপাবলীর প্রদীপের আলোয় তারা ধ্বংস হয়। পাশাপাশি দীপ ও আলোবাজির ধোঁয়ায় বিনাশ হয় ক্ষতিকর জীবাণু।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সমসাময়িক ভাটপাড়া নিবাসী পণ্ডিত হরিচরণ শিরোমণি লিখেছেন, শ্যামা মা ভয়ের দেবী নন। কিছু মানুষ মনগড়া উপকথা লিখে তাঁকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। শ্মশানে তাঁর স্থান নয়— তিনি লক্ষ্মী, ঘরের কন্যা। তিনি বসনহীনা নন, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ছাপিয়ে তিনি রয়েছেন, সেই আবরণের ভেতর তাঁর পরিপূর্ণ অবস্থান। অন্ধকারের পরেই আলোর আভায় উদ্ভাসিত জগৎ সংসার। সেই আলোকবর্তিকা তিনি বয়ে এনেছেন। অন্ধকারের গভীরতা ক্ষণিকের, আলোর পূর্ণতা অনন্ত। এই অন্ধকার মানে অজ্ঞানতা। এই অজ্ঞানতা যেন অন্ধকার ভেদ করে পূর্ণ আলোতে মিশে যায়।

শাস্ত্র অনুসারে দেবীকালীর গাত্রবর্ণ কালো। এই কৃষ্ণবর্ণ অশেষ সময়কাল, সব রঙের উৎস হিসেবে রূপকল্প ও মহাশূন্যের দিক নির্দেশক। তিনি মায়া মোহ মুক্ত, সম্মুখে প্রসারিত অগ্নি রঙের জিহ্বা ও মুক্তকেশ রূপ অশুভ শক্তির বিনাশ এবং একান্ন নরমুণ্ড শব্দব্রহ্ম হিসেবে প্রতীয়মান হয়। দেবীর হাতে অস্ত্র ছাড়াও আছে বরাভয় ও আশীর্বাদ।

ষোড়শ শতকে বীরভূমের কাশীনাথ ভট্টের শিষ্য ও পরম কালীভক্ত তন্ত্রসাধক নদীয়ার বাসিন্দা কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ দেবীমূর্তির সাকার রূপ কল্পনা করে পূজা করেন। বলা হয় তার আগে বিভিন্ন ধাতুর পাত্রে যন্ত্র স্থাপন করে দেবীরূপ কল্পনা করে পূজা করা হতো। এরপর বিভিন্ন সাধক তাঁদের নিজস্ব মতে দেবী কালীর রূপ প্রদান করে সাধনার পথও ভিন্ন করে দেন। প্রথম দিকে শক্তির দেবী হিসেবে দেবীকালীর পূজা গৃহস্থ বাড়িতে করা হতো না। পরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় মাতৃসাধক রামপ্রসাদ সেন বা কমলাকান্ত ভট্টাচার্য গৃহে কালীসাধনার প্রবর্তন করেছিলেন বলে কথিত। তবে অঘোর মতের তান্ত্রিকরা গৃহে দেবীকালী পূজা করার বিরোধী ছিলেন বলে জানা যায়।

বঙ্গে সাধারণভাবে কিছু লৌকিক ও শাক্তমতেই পূজার্চনা করা হতো। পাল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধমতের প্রসার ঘটেছিল। তবে শাক্তদের সঙ্গে বৌদ্ধ শক্তিসাধনার সেই অর্থে কোনো বিরোধ ছিল না। ইসলামি আগ্রাসনের কালে সনাতনীদের ধর্মপালন, শান্তিপূর্ণভাবে জীবন ধারণ ভয়াবহ আকার নেয়। এই সময় শ্রীচৈতন্যদেব বৈষ্ণব আন্দোলনের সূচনা করেন। সমাজ ব্যবস্থা কিছুটা স্থিতিশীল হয়। ইংরেজ শাসনের পর শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কারের পর দুর্গাপূজা-সহ বিভিন্ন দেব-দেবী পূজার প্রচলন ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। দিনে দিনে এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। এখন তো প্রকৃত ভক্তি শ্রদ্ধা ছাড়াই পাড়ায় পাড়ায় মোচ্ছবে মেতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে শ্যামা মায়ের আরাধনা।

বঙ্গের বহু জমিদার, ডাকাত ও পরে দেশভক্ত মহান বিপ্লবীরা দেবী কালীর পূজা করতেন। দেবী কালীর উপাসনা কিন্তু নতুন কিছুই নয়। খ্রিস্টপূর্ব তিন শতাধিক বছর আগে লিখিত কালী মুণ্ডক উপনিষদে দেবী কালীর উল্লেখ রয়েছে।

দীপাবলী ও বঙ্গে অনুষ্ঠিত দীপান্বিতা কালীপূজা সমার্থক হলেও সমগ্র ভারতে এবং দেশের বাইরে থাকা সনাতনীদের কাছে ভিন্ন অর্থ ও তাৎপর্য আছে। দীর্ঘ সময় ধরে বঙ্গের সনাতনীদের কাছে পূজার্চনাকে শ্রদ্ধা-ভক্তির পরিবর্তে উৎসবে রূপান্তরিত করার চেষ্টা হয়েছে। এই সামাজিক অবক্ষয়ের প্রতিবাদে সরব হয়েছে সনাতনীদের বড়ো একটা অংশ। এবারের আলোর উৎসব হবে অজ্ঞতা দূর করে জ্ঞানের আলোয় ফেরা। □



চোরবাগান মিত্র পরিবারের ৩৭৭ বছরের প্রাচীন কালীপূজা

সপ্তর্ষি ঘোষ

উত্তর কলকাতার চোরবাগানের মিত্রবাড়ির কালীপূজা কলকাতার প্রাচীনতম পারিবারিক কালীপূজা। আজ থেকে ৩৭৬ বছর আগে ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে চোরবাগান মিত্রবাড়িতে কালীপূজার সূচনা হয়। সে সময়ে দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়নি। কলকাতায় এর থেকে প্রাচীন পারিবারিক কালীপূজা আর আছে বলে জানা যায় না। কনৌজ থেকে যে পাঁচজন কায়স্থ সর্বপ্রথম বঙ্গদেশে এসেছিলেন, তাঁদেরই একজন কালিদাস মিত্র। আজকের চোরবাগানের মিত্র পরিবার তাঁরই উত্তরসূরী। মিত্র পরিবার কলকাতার এক অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত পরিবার। কালিদাসের অষ্টাদশ অধস্তন বংশধর রামরাম মিত্র ছিলেন মুর্শিদাবাদ নবাবের দেওয়ান। তখন তাদের নিবাস ছিল হুগলী জেলার কোন্নগর মন্দিরবাটি থেকে কলকাতার গোবিন্দপুর মৌজার সখের-বাজার অঞ্চলে বিশাল প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্মাণ করে বসতি স্থাপন করেন। সেদিনের সখের বাজারই আজকের 'চোরবাগান'। রামমন্দির সংলগ্ন চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ থেকে মুক্তারামবাবু স্ট্রিটে ঢুকলে ডান দিকে ছয়টি লালরঙের বিশাল থামওয়ালা মিত্রবাড়ি চোখে পড়বে। যে বাড়ি আজও তার প্রাচীন ঐতিহ্যকে সগৌরবে বহন করে চলেছে।

৮৪ নম্বর মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের মিত্রবাড়িতে কালীপূজার শুরু ইংরেজি ১৬৫০ সালে। দিল্লির মসনদে তখন আসীন মুঘল বাদশা শাজাহান। সেই থেকে আজ পর্যন্ত এই পূজা অবিচ্ছিন্নভাবে হয়ে আসছে। এই সুদীর্ঘ সময়ে অনেক আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন, অনেক উত্থান-পতন ঘটেছে। সেই আবর্ত থেকে মিত্র পরিবারও বাদ যায়নি। কিন্তু পূজায় ছেদ পড়েনি একটি বছরের জন্যও। বাড়ির ছেলে-মেয়েরা চিন্তায় ও মননে আধুনিক হলেও দেবীর পূজায় খুবই শ্রদ্ধাশীল ও আন্তরিক।

মিত্র পরিবারের প্রতিমা মুক্তকেশী দক্ষিণাকালী। প্রতিমার গায়ের রং ঈষৎ নীলাভ। এই প্রতিমার মধ্যে শ্যামামায়ের ভয়ঙ্করী রূপের প্রকাশ নেই। দেবী এখানে প্রসন্নবদনা। শতবর্ষ অতিক্রান্ত হওয়ার পর ইংরেজি ১৭৫০ সালে রামসুন্দর মিত্র স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে আঠারো ফুট উচ্চতার কালী প্রতিমার প্রচলন করেন। শোনা যায়, সে সময় প্রতিমার সমান উচ্চতায় নানাবিধ মিষ্টি দ্রব্য নৈবেদ্য হিসেবে দেবীকে নিবেদন করা হতো। সেজন্য মিত্র পরিবারের কালীর পরিচয় ছিল 'মিঠাইকালী' রূপে। পূজার পর দরিদ্রনারায়ণ সেবায় সেই মিষ্টি বিতরণ করা হতো। এখন অবশ্য কালীমূর্তি আর আঠারো ফুট নেই, দশ ফুটে রূপান্তরিত হয়েছে।

অতীতে বিস্তর ধুমধাম ছিল মিত্রবাড়ির কালীপূজায়। যাত্রা, তরজা, কবিগান চলতো ক'রাত্রি ধরে। দূরদূরান্ত থেকে লোকে আসতো সেসব শুনতে। এই পূজা উপলক্ষ্যে ক্লাইভ, ওয়ারেন হেস্টিংস এবং পরে ইংরেজ সরকারের বহু গণ্যমান্য ও উচ্চপদস্থ কর্মচারী আমন্ত্রিত হয়েছেন। এ বিষয়ে পুরনো পত্রপত্রিকায় উল্লেখ রয়েছে। অতীতের সেই সব জাঁকজমক আজ নীরব ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করছে।

কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয় তিন শরিকের মধ্যে পালা করে। চোরবাগানে ১ নম্বর মিত্র লেন ও ৮৪ নম্বর মুক্তারামবাবু স্ট্রিট— পাশাপাশি দুই শরিকের বাড়ি এবং দক্ষিণ কলকাতার ১৫৮ নম্বর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোডে আর এক শরিকের বাড়ি। যে বছর যে শরিকের বাড়িতে পূজা হয়, পূজার সংকল্প হয় সেই পালাদারের নামে। মিত্রবাড়ির কালীপূজায় পশুবলির প্রথা নেই। দেবীকে অন্নভোগ দেওয়া হয় না। তার বদলে দেওয়া হয় লুচি, সুজি, বিভিন্ন রকম ভাজা ও নিরামিষ ব্যঞ্জন। আগের মতো আড়ম্বর না থাকলেও মিত্র পরিবার আজও পূজায় প্রাচীন ঐতিহ্য ও পরম্পরা সগৌরবে বহন করে চলেছে। □



শক্তি সাধনা, শাক্ত পদাবলী

নন্দলাল ভট্টাচার্য

আদ্যাশক্তি

বিশ্বাসের সুপ্রজ্ঞ উৎস থেকে উৎসারিত বোধেরই নাম ধর্ম। সেই উপলব্ধিই সবকিছুর মূলীভূত শক্তি। সেটাই আদিশক্তি— পরমাপ্রকৃতি মহামায়া যোগমায়া। তাঁর কোনো দ্বিতীয় নেই। 'একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া বা সমাপরা। পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্বিভূতয়ঃ ।।'— এই ব্রহ্মাণ্ডে বা জগতে একমাত্র আমি—আমিই বিরাজ করছি— দ্বিতীয় আর কেই নেই। ...এই যে অন্যান্য দেবীরূপ দৃশ্যমান— তা সব আমারই বিভূতি। এরা আমার থেকে উদ্ভূত, আমার মধ্যেই বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

সপ্তশতী চণ্ডীতে কথাগুলি বলেছেন স্বয়ং মহামায়াও। তাঁর এই উক্তিকেই বলা যায়— শাক্ত মত বা মতবাদের সারকথা। এর মর্ম, আদ্যাশক্তি যাঁর অন্যনাম পরাশক্তি, তিনিই সৃষ্টির সর্বোচ্চ পরম নারী শক্তি। তিনিই আদি শক্তি— তিনিই যোগমায়া মহামায়া।

এই আদি শক্তি নিজে অজন্মা— অর্থাৎ তিনি জাত নন, কিন্তু তিনিই সব কিছুর জন্ম দেন। তিনি একইসঙ্গে নিরাকারা অর্থাৎ আকার বা অবয়বহীন। আবার প্রয়োজনে তিনিই সাকারা। রূপহীন তিনিই অপরূপা। তিনিই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর এবং সব দেবতার সৃষ্টিকারিণী— তিনিই এই বিশ্ব চরাচরের সৃষ্টি-স্থিতি-বিলয়ের হেতু। সব কিছুর অস্তিত্ব নির্ভর করছে তাঁরই উপর।

হিন্দু ধর্মের যত দেবী আছেন— দুর্গা-কালী-সরস্বতী-লক্ষ্মী- পার্বতী প্রমুখ সকলেই ওই আদ্যাশক্তিরই এক একটি রূপ। যুগের প্রয়োজনে, দশের প্রয়োজনে, সবার উপরে নিজের ইচ্ছাতেই তিনি নিজেই অজস্র রূপে আবির্ভূতা হন— এমন নানা নামে।

শাক্ত ঐতিহ্যে তিনিই সৃষ্টি ও স্থিতি বা পালনের অধীশ্বরী— পরমা মাতা— পরব্রহ্ম স্বরূপা। তিনি পরমপূজ্যা।

এই যে দেবী আদ্যাশক্তি— তাঁর মহিমা উদ্গীত ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের দেবীসূক্তে (১২৫তম সূক্ত)। সেখানে ঋষি অম্ভৃণ-কন্যা বাক্-ই আদ্যা দেবী। নিজের স্বরূপ ব্যক্ত করে তিনি বলেছেন,— 'অহমেব বাত ইব প্রবাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা... আমিই ভূ-ইত্যাদি সমস্ত লোক সৃষ্টি করেছি। বাতাসের মতোই সকলের অন্তরে-বাহিরে আমি বিচরণ করি। স্বরূপত আকাশ-পৃথিবীর অতীত অ-সঙ্গ ব্রহ্ম স্বরূপিণী হয়েও আমি সমগ্র জগদ্ রূপে আবির্ভূতা।

ব্রহ্মস্বরূপা আদ্যাশক্তিই অশুভের বিনাশ এবং শুভের প্রতিষ্ঠায়,দুষ্কৃতীদমনে আবির্ভূতা হন দুর্গারূপে— মন্বন্তরে-মন্বন্তরে। দুষ্ট অসুরদের বধ করেন তিনি। দেবতাদের প্রতিষ্ঠা করেন অমরলোকে।

আদ্যাশক্তি দুর্গা থেকেই উদ্ভূত দেবী কালী। এটা পুরাণ কথা। পুরাণের আগে বেদেও আছে কালীর উল্লেখ। ঋগ্বেদে রাত্রিসূক্তে রয়েছে কালীর আভাস। স্পষ্টভাবে দেবী কালীর কথা বলা হয়েছে কৃষ্ণ যজুর্বেদের কাঠক গৃহ্যসূত্রে, অথর্ব বেদে, মুণ্ডক, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ইত্যাদিতেও। তবে কোথাও তিনি অগ্নির একটি রূপ, কোথাও বা রুদ্রের। কালের সঙ্গে যুক্ত তিনি। বৈদিক সংস্কৃতে কালী-র অর্থ— কাল বা সময়ের নিয়ন্ত্রক কৃষ্ণবর্ণা দেবী। রাত্রি, অন্ধকার বা কৃষ্ণবর্ণের গুণবাচক রূপ বা বিশেষণ এটি।

কৃষ্ণ যজুর্বেদে কাঠক সূত্রে বিবাহের সময় সুগন্ধি আহুতি দেওয়া হয় যেমন বৈদিক দেবতাকে, তার মধ্যে আছেন কালী ও ষষ্ঠীও। কাঠক সূত্রের ১৯।৭ পটলে ওই আহুতি মন্ত্র আছে, 'অগ্নিং সোমং বরুণং মিত্রবিন্দ্রং...কালীং ষষ্ঠীং গন্ধাহুতিভির্যজতে'। যার অর্থ বৈদিক বিবাহে গন্ধ আহুতি দেওয়া হয় কালীকেও।

কালের স্ত্রীলিঙ্গ কালী। তিনিই সৃষ্টির আদি উৎস-পরমাশক্তি। একথাই আছে অথর্ববেদের কালসূক্তে (৫৩ এবং ৫৪)। মুণ্ডক উপনিষদ (১।২।৪) অগ্নির সপ্তজিহ্বার একটি কালী— কালীং কপালীং ধূম্রবর্ণাম্। শ্বেতাশ্বতর উপনিষেদে (৪।৫) রুদ্রের অসংখ্য শক্তির একটি হলো কালী— 'রুদ্রস্য যাসাম কালী করালী চ। বৈদিক সাহিত্যের কাল, অগ্নি, রুদ্রই তন্ত্র ও পুরাণে হয়ে যান কালী।

কৌশিকি কথা :

পুরাণ কথা, শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের সময় দেবী দুর্গার দেহ থেকে উদ্ভূত হন দেবী কৌশিকী। স্কন্দ পুরাণের দেবী মাহাত্ম্যর বর্ণনা, পার্বতীর দেহকোষ সঞ্জাতা বলে নাম হয় তাঁর কৌশিকী। ওই রূপেই বধ করেন তিনি শুম্ভ নিশুম্ভকে।

পৌরাণিক কাহিনি, দুষ্ট অসুরদের বধ করার জন্য মহাদেবী দুর্গা বা পার্বতীর দেহকোষ থেকে সৃষ্টি হয় অন্ধকাররূপী কৌশিকীর। আর সেই সঙ্গে দেবী নিজেও হন কৃষ্ণবর্ণা— দেবী কালিকা।

লক্ষ্মীতন্ত্রে দেবরাজ ইন্দ্রকে দেবী কৌশিকীর কথা শোনান স্বয়ং লক্ষ্মী। তিনি বলেন, গৌরীর দেহ থেকে সৃষ্টি হয়েছিল কৌশিকীর। অন্যদিকে কালিকাপুরাণ অনুযায়ী কৌশিকীর আবির্ভাব হয়েছিল দেবী মাতঙ্গীর দেহ থেকে।

এই প্রসঙ্গে শিবপুরাণের কাহিনি আবার অন্যরকম। পার্বতীর কালো রং দেখে শিব একবার তাঁকে কালী বলে উপহাস করেন। সেই উপহাসে ক্ষুব্ধা পার্বতী গৌরবর্ণা হবার জন্য হিমালয়ে তপস্যায় বসেন। সেই তপস্যার এক মুহূর্তে খসে পড়ে তাঁর দেহের কৃষ্ণকোষ। আর সেই কোষ থেকেই উদ্ভব হয় দেবী কৌশিকীর অসুর বধের জন্য। অন্যদিকে পার্বতীও হন গৌরী।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবী মাহাত্ম্যের

বর্ণনা, চণ্ড-মুণ্ড নামে দুই অসুর দেবী দুর্গাকে আক্রমণ করলে ক্রোধে তাঁর আনন হয় ঘন কৃষ্ণবর্ণ। সেই সময় তাঁর কপাল থেকে আবির্ভাব হয় দেবী কালীর।

সেদিক থেকে দুর্গা কালীর অগ্রজা। বঙ্গদেশে কালীপূজার বহু আগে থেকেই শুরু হয় দুর্গা পূজা। সেই পূজা পরিণত হয় উৎসবেও। বছরের নির্দিষ্ট সময়ে হয় তাঁর পূজা। কিন্তু শাক্ত-সাধনায় দুর্গা নন, কালীই হয়ে ওঠেন উপাস্য। কার্যত শাক্ত সাধনার কেন্দ্রে রয়েছেন কালী। তন্ত্রের প্রভাবে তা পেয়েছে ভিন্ন মাত্রা। শাক্ত সাধনায় তন্ত্রের প্রভাবের এই সাধনার প্রতি রয়েছে মানুষের আকর্ষণ ও বিকর্ষণও। রয়েছে ভয় ও ভক্তি। সাধনার রূপও তাই।

বামাচারে বীরাচারী সাধনায় পঞ্চ 'ম'কারের টানে যেমন অনেকে উপযুক্ত না হয়েও শাক্ত সাধনার বাহ্যিক দিকেও দেন জোর। আর সেটাই মানুষের ভয় ও বিরাগের কারণ। অন্যদিকে দক্ষিণাচারে— ভক্তি, মন্ত্র, বৈদিক আচার পায় প্রাধান্য। গৃহস্থ ও সাধারণ মানুষ বেশি আকৃষ্ট এই ধারায়। এই ধারাতেই পুষ্ট হয়েছে বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি। সৃষ্ট হয়েছে এক পৃথক সাধন ধারার।

মাতৃসাধনা

হিন্দুধর্মে সাধনার যতগুলি ধারা রয়েছে, তার অন্যতম হলো শক্তি সাধনা। দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তনে সৃষ্টি রহস্যর একটি বিশিষ্ট তত্ত্ব হলো শাক্ত মত। এই মতের মূল লক্ষ্য, শিব বা নিষ্ক্রিয় শুরু চেতনা এবং শক্তি অর্থাৎ সক্রিয় সৃজনশীলতার মিলনের মধ্য দিয়ে মুক্তি বা মোক্ষলাভ।

শক্তি সাধনা বা শাক্ত মতবাদের মূল কথা, সৃষ্টির আদি শক্তির ঐশ্বরিক রূপটিকে মা হিসেবে হৃদয়াকাশে স্থাপন করে তাঁরই উপাসনা করা। এই মাতৃমূর্তির বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে রয়েছেন কালী, দুর্গা, ললিতা, ত্রিপুরসুন্দরী ইত্যাদি। বঙ্গে এঁদের মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছে কালী সাধনা।

মাতৃশক্তির অন্যান্য রূপগুলির অর্চনা করা হয় বছরের কতকগুলি নির্দিষ্ট সময়ে। কিন্তু তাঁদের নিত্যপূজা অথবা তাঁদের ধ্যানের কেন্দ্রে রেখে মুক্তি বা মোক্ষলাভের জন্য সাধনার নীরব প্রায় নেই বললেই হয়। কিন্তু কালীর ক্ষেত্রে বিষয়টা সম্পূর্ণ আলাদা। বাংলাদেশে শিব মন্দিরের প্রায় সমান অথবা কিছু বেশি সংখ্যায় রয়েছে কালীমন্দির। কালীমন্দিরের সংখ্যার সঙ্গে একমাত্র তুলনা করা যাতে বৈষ্ণবীয় ধারার গোপাল-গোবিন্দ, রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের।

কেবল মন্দিরে স্থাপন করে কালীর নিত্যসাধনা নয়, সাধারণ গৃহস্থ যেমন কালীর নিত্যপূজা করেন, একইভাবে তন্ত্র সাধকরাও কখনো শ্মশানে, কখনো-বা কোনো নির্জন স্থানে বসে কালীসাধনা করেন। কালীকে উপাস্য করে মুক্তিসন্ধানীর সংখ্যাটা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। বস্তুত বৈষ্ণবীয় সাধনায় কৃষ্ণসাধনার সঙ্গেই তুলনা চলে এর। অবশ্য শৈব সাধকের সংখ্যাও এদেশে বড়ো কম নয়।

তাত্ত্বিক দিক থেকে কালী উপাসনার ক্ষেত্রে বহমান বৈদিক ও তান্ত্রিক সাধনার দুটি ধারা— দক্ষিণাচার ও বামাচার। বামাচার সম্পূর্ণ ভাবেই তন্ত্র নির্ভর। কিন্তু গৃহস্থ ও সাধারণ মানুষ ভক্তি ও মন্ত্র-নির্ভর দক্ষিণাচারের পথেই চলেন।

কালী বহুরূপা

কালী বহুরূপা রূপ কল্পনায় ঘটেছে করুণা ও মাহাত্ম্যের এক অপূর্ব মেলবন্ধন। কালী করুণাময়ী আবার অশুভ বা অসুর বিনাশিনী। তিনিই আদি শক্তি। এই বিশ্বসৃষ্টির আগে ছিল কেবল অন্ধকার। তাই তিনি কৃষ্ণবর্ণা। প্রকৃতির মতোই বন্ধনহীন বলে তিনি মুক্তকেশী। কালী চতুর্ভুজা। তাঁর বাম হাত দুটিতে থাকে অজ্ঞানতা ও অহংকার নাশের জন্য অসি এবং অসুর বা অশুভের ছিন্নমুণ্ড। অন্যদিকে ডান হাত দুটি দেয় বরাভয়। জগতের সব পাপ বিনাশের জন্য তিনি লোলজিহ্বা। বর্ণমালার পঞ্চাশটি অভয়ের প্রতীক তাঁর কণ্ঠের মুণ্ডমালা। সবরকম মায়ার অতীত এবং সমস্ত আকাশ তাঁর অম্বর বা পরিধেয় তাই তিনি দিগম্বরী। স্থির বা নিষ্ক্রিয় পুরুষ হলেন শিব। আর সক্রিয় প্রকৃতির প্রতীক কালী। শক্তি ছাড়া সব কিছু 'শব' একথা বোঝাতেই শায়িত শিবের বুকে তাঁর পা। ওই পায়ের স্পর্শেই শব হবেন শিব।

তন্ত্র ও পুরাণ মতে দেবী কালী বহুরূপা। তাঁর অষ্ট বা নবকালী রূপেই পূজিত হয় ঘরে-বাইরে। তোড়লতন্ত্র অনুযায়ী কালীর আটটি রূপ। যেমন— দক্ষিণাকালী, শ্মশানকালী, সিদ্ধকালী, গুহ্যকালী, ভদ্রকালী, মহাকালী বা রক্ষাকালী, চামুণ্ডা ও শ্রীকালী। মহাকাল সংহিতায় তাঁর রূপ ৯টি। ওই তালিকায় পাওয়া যায় কালকালী বা কৃষ্ণকালী, কামকলাকালী, ধনদাকালীর নাম। এইসব কালী মূর্তির মধ্যে সিদ্ধকালী, গুহ্যকালী, শ্মশানকালী ও চামুণ্ডা কালীর পূজা করেন কেবল সাধকরা নির্জনে। গৃহস্থ বাড়িতে এঁদের পূজা হয় না।

কালী পরমাপ্রকৃতি, আদ্যাশক্তি। তবুও ভক্তকল্যাণে তিনি আবির্ভূতা নানা রূপে। কালীবিলাস তন্ত্রমতে, 'কার্তিকে কৃষ্ণপক্ষে তু পক্ষদশ্যাং মহানিশি।/ আবির্ভূতা মহাকালী যোগিনী কোটি ভিঃ সহা'— কার্তিকেয় অমানিশায় তিনি আবির্ভূতা হন। এটাই তাঁর আবির্ভাব তিথি। সে কারণেই কার্তিক মাসের কালীপূজা করেন অসংখ্য মানুষ, বাড়িতে বারোয়ারি বা সর্বজনীন মণ্ডপে।

ধর্ম সাধনায় ভক্তিবাদ

সনাতন ধর্মে মোক্ষ বা মুক্তি লাভের জন্য মূলত চারটি প্রধান মার্গ বা পথ রয়েছে। এই চারটি প্রধান মার্গ হলো ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম এবং রাজযোগ বা অষ্টাঙ্গ যোগ। এই চারটি পথের মধ্যে সাধারণের জন্য ভক্তি-মার্গ— হলো তুলনায় সবচেয়ে সহজ পথ।

ভক্তি মার্গের মূলকথা, জপ, কীর্তন, প্রার্থনা এবং সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনের মধ্য ভগবানের আরাধনা করা। এটি হলো ঈশ্বরের প্রতি পরম প্রেম এবং ভক্তির পথ। বঙ্গদেশে বৈষ্ণব ও শাক্তরাই ভক্তিমার্গের গরিষ্ঠ পথিক। এই ভক্তিমার্গ কেবল বঙ্গদেশে নয়, সারা ভারতেই আধ্যাত্ম সাধনার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। সামাজিক ক্ষেত্রেও ভক্তিমার্গ নিয়েছে একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। ভক্তিমার্গ অন্য অর্থে সমাজের সব শ্রেণীর মানুষকে একই স্তরে স্থিত করে সৃষ্টি করে একধরনের সাম্য ও সংহতির।

বঙ্গদেশে ভক্তিমার্গ প্রবাহিত হয়েছে মূলত বৈষ্ণব এবং শাক্তসাধনা পথে। ঐতিহাসিকভাবে বঙ্গের সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ ও সংগঠনে বিশেষ তাৎপর্যকর ভূমিকা নেয় মধ্যযুগে। আচারসর্বস্ব সাধনার পথকে এড়িয়ে বাঙ্গালিকে ঈশ্বরের প্রতি গভীর ব্যক্তিগত ভালোবাসার সরণিতে পদচারণা করার সুযোগ এনে দেন বৈষ্ণব ও শাক্ত ভক্তি

সাধকরা। ষোড়শ শতকে শ্রীচৈতন্যর আবির্ভাব বঙ্গের বৈষ্ণব আন্দোলনকে একটা গণআন্দোলনে পরিণত করে। একই সঙ্গে বাংলা সাহিত্যকেও সমৃদ্ধ করে। অবশ্য শ্রীচৈতন্যর দুই শতাব্দী আগে থেকেই রাধাকৃষ্ণের অলৌকিক লীলা অবলম্বনে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রমুখ অপূর্ব পদাবলী রচনা করে সারা দেশেই বৈষ্ণবীয় ভক্তিমার্গের প্রবাহপথকে সুগম করেন। জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাশ, বলরাম দাস প্রমুখ সে ধারাকে করেন আরও বেগবান।

শাক্ত সঙ্গীত-রূপে-অরূপে

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের শেষপর্বে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতকে অনেকটা বৈষ্ণবীয় পদাবলীর ধারাতেই শুরু হয় শাক্ত পদাবলীর যাত্রা। দেবী শক্তির মহিমা প্রকাশের লক্ষ্যেই কালী, উমা, দুর্গা পার্বতীকে কেন্দ্র করে বিকাশ ঘটে শাক্ত পদাবলীর। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রায় সবটাই মৈথিলি ও ব্রজবুলি ভাষায় রচিত। শাক্ত পদাবলী কিন্তু সম্পূর্ণভাবেই বাংলায় লেখা। সেদিক থেকে শাক্ত পদাবলী বাংলা সাহিত্যের এক অন্তরঙ্গ সম্পদ।

দেবীর ভয়ংকরী রূপ নয়, বরং পার্থিব জগতের মমতাময়ী মা, আদরের কন্যার রূপটিই বিকশিত হয়েছে শাক্ত পদাবলীতে। সমাজ-সংসারকে কেন্দ্র করে আবর্তিত এই পদাবলী মানবিক আবেদন ও তীব্র জীবনবোধে বাঙ্গালি জীবনের অকৃত্রিম রূপটিকেই তুলে ধরেছে। আর সে কারণেই বাংলা সাহিত্যে শাক্ত-পদাবলী এক ও অনন্য হয়ে রয়েছে।

নন্দনতত্ত্বের বিচারে বৈষ্ণব পদাবলীগুলি রস-রাজ শৃঙ্গারের রাগে রঞ্জিত। রাধাকৃষ্ণর প্রেমলীলাই এই পদাবলীর প্রধান উপজীব্য। অন্যদিকে শাক্ত পদাবলীগুলি বাৎসল্য রসে অভিসিঞ্চিত। এক পর্যায়ে এই গীতি ধারায় মাতৃহৃদয়ের উৎকণ্ঠা, বেদনা ও ভালোবাসার বিষয়গুলির সঙ্গেই রয়েছে মায়ের কাছে সন্তানের সব অভিযোগ, চাওয়া-পাওয়া, আকুতি-অভিমান আর অন্তিমে মায়ের কোল বা চরণে স্থান পাওয়ার বাঁধভাঙা ব্যাকুলতার প্রকাশ। এসবের মধ্য দিয়েই শাক্ত- পদগুলি হয়ে উঠেছে সমকালীন সমাজেরও এক বাস্তব চিত্র।

শাক্ত পদাবলীর এই বৈশিষ্ট্য দেখেই বাংলা সাহিত্যের অন্যতম ইতিহাসকার ভূদেব চৌধুরীর মন্তব্য, 'বৈষ্ণব পদাবলী গোষ্ঠীগত প্রেমবিশ্বাসের ভক্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত। তাই এই পদসাহিত্যে ধর্ম ও ধর্মানুরাগ সমসূত্রে বিধৃত, একে অন্য থেকে অবিচ্ছিন্ন। কিন্তু শাক্ত সঙ্গীতের মর্মোৎসারিতা ধর্ম-নিরপেক্ষ ব্যক্তি-চিত্ত প্রচারে সমাকুল। এইখানেই এই দুই শ্রেণীর ধর্মনির্ভর গীতি সাহিত্যের ঐতিহাসিক পার্থক্য মূল।'

বিশেষজ্ঞরা শাক্ত পদাবলীগুলিকে বারোটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। পর্যায়গুলি হলো— বাল্যলীলা, আগমনী, বিজয়া, জগজ্জননী, মা কে ও কেমন, আকুতি, মনোদীক্ষা, নাম মহিমা, মাতৃপূজা, সাধনশক্তি, ইচ্ছাময়ী/ব্রহ্মময়ী ও লীলাময়ী।

এই পর্যায়গুলির মধ্যে প্রথম তিনটি অর্থাৎ বাল্যলীলা, আগমনী ও বিজয়ার কেন্দ্রীয় চরিত্র উমা বা পার্বতী বা দুর্গা এবং মেনকা ও গিরিরাজ। বাকিগুলি প্রায় সবই কালী বা শ্যামাকেন্দ্রিক। ওই গানগুলির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে সাধক বা ভক্তের প্রাণের আকুতি।

আগমনী এবং বিজয়া পর্যায়ের গানগুলি অনেকটাই বিশেষ সময় বা কালনির্ভর। বলা যায়, শরতের নীল আকাশ যেন এইসব গানের পটভূমি। দুর্গাপূজার আগে দেবী দুর্গার পিতৃগৃহ বা বাপের বাড়ির আমাকে উপলক্ষ্য করে মা মেনকার মনোবেদনা কেন্দ্রিক এই গানগুলি। এ গানে আছে এক ধরনের আশা ও আনন্দর আভাস। আছে কিছুটা অনুযোগও। কিন্তু বিজয়া পর্যায়ের গানগুলি যেন বড়োই বেদনাবিধুর। কন্যারূপী উমা বা দুর্গার পতিগৃহ তথা কৈলাসে ফিরে যাওয়ার মুহূর্তে কন্যাবিচ্ছেদে আকুলতা মায়ের হৃদয়বেদনা এই গানগুলির প্রধান উপজীব্য।

আকুতি পর্যায়ের গানে রয়েছে অভিমানী ছেলে আর মায়ের সম্পর্কের এক সুমধুর চিত্র। সাধক এখানে কালী বা শ্যামামায়ের পাগল ছেলে। মা-সর্বস্ব ছেলের আবদারের যেন শেষ নেই। কখনো তীব্র অভিমান, কখনো নানা অভিযোগ, কখনো-বা প্রাণপ্রতিম মা-কে ছেড়ে যাওয়ার ভয় পর্যন্ত দেখায় সাধক-সন্তান। এত সবের পরেও সন্ধ্যায় নীড়ে ফেরা পাখির মতোই মায়ের কোলে ওঠা বা তাঁর রাঙা পায়ে ঠাঁই পাওয়ার প্রবল আকুতির প্রকাশ ঘটে এই গানগুলিতে।

শাক্ত পদাবলীগুলি এক অর্থে যেন এক ব্যতিক্রমী রচনা। বিভিন্ন স্তবস্তুতির মতো এই গানগুলিতেও সাংসারিক নানা অভাব অভিযোগ, দুঃখ-কষ্ট, নির্যাতন, রোগভোগ ইত্যাদি বিভিন্ন পার্থিব বিষয়ের কথা থাকলেও সন্তান কোনো সময়ই সেইসব থেকে উত্তরণের জন্য প্রার্থনা জানাননি। সন্তান সব সময়ই চেয়েছেন মায়ের ওই দুটি রাঙা পায়ে একটুখানি ঠাঁই। অর্থাৎ জাগতিক দুঃখ দুর্দশা থেকে পরিত্রাণ নয়, সাধক চেয়েছেন চিরমুক্তি বা মোক্ষ। সেই কারণেই এই পর্যায়ের গানগুলি রূঢ় বাস্তবতার এক সজীব চিত্ররূপ হয়েও শেষপর্যন্ত সবদিক থেকেই ভক্তিরসের এক অমৃতকুম্ভ হয়ে উঠেছে। সারল্য এবং সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনের এই স্বতঃস্ফূর্ততার কারণে গানগুলি সাধারণ মানুষকেও করে ভাববিহ্বল।

তান্ত্রিক সাধনা এবং বাস্তবতার অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটেছে শাক্ত পদাবলীগুলিতে। সে কারণেই গানগুলি সর্বার্থেই হয়ে উঠেছে গণসঙ্গীত। সম্প্রদায় নির্বিশেষে সব মানুষেরই হৃদয় মথিত হয় এই গানে। ধর্ম বিশ্বাসের চেয়েও এক ধরনের ভাববিভোরতা রয়েছে সঙ্গীতে। হৃদয়ের উৎস-ভূমি থেকে উৎসারিত এইসব গান রচনায় কেবল সাধককুল নয়, এগিয়ে এসেছেন মায়ের স্নেহ কাঙাল কবিরাও। ফলে এক ধরনের বিশ্বমানস যেন প্রতিবিম্বিত শাক্ত পদাবলীতে। সে কারণেই এগুলি বাংলা সাহিত্যের এক অপূর্ব সম্পদ।

শাক্ত পদাবলীকারদের মধ্যে রয়েছেন বিশিষ্ট শাক্ত সাধক থেকে সে অর্থে শাক্ত নন এমন বহু কবি। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন, রামপ্রসাদ সেন, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, দেওয়ান রামদুলাল নন্দী, রাজা রামকৃষ্ণ রায়, মহারাজ নন্দকুমার, দাশরথি রায়, রাম বসু, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি, হরিনাথ মজুমদার (কাঙাল ফিকির চাঁদ) গিরিশচন্দ্র ঘোষ থেকে শুরু করে কাজি নজরুল, ভবা পাগলা এবং আরও অনেকে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণভাবে রয়েছেন রবীন্দ্রনাথ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও। রবীন্দ্রনাথের 'উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে', বা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'চরণ ধরে আছি পড়ে' নিঃসন্দেহে শাক্ত পদাবলীর উজ্জ্বল নীলমণি।



বরেণ্য বিপ্লবীদের স্মৃতিবিজড়িত পাথুরিয়াঘাটার বড় কালীপূজা

সৌম্যব্রত দাশগুপ্ত

উত্তর কলকাতার পাথুরিয়াঘাটা। পুরনো বাড়ি, সরু গলি আর ইতিহাসের গন্ধমাখা এই পাড়ার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বঙ্গের বিপ্লবী আন্দোলনের এক গৌরবময় অধ্যায়। এখানকার বড় কালীপূজা শুধু ধর্মীয় উৎসব নয়। এর সঙ্গে মিশে আছে বাঘাযতীনের বিপ্লবী আদর্শ, শরীরচর্চার আড়ালে স্বাধীনতার প্রস্তুতি এবং নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর স্মৃতি।

পাথুরিয়াঘাটা সর্বজনীন বড় কালীপুজোর ইতিহাস বুঝতে হলে ফিরে তাকাতে হয় পাথুরিয়াঘাটা ব্যায়াম সমিতির দিকে। 'বাঘাযতীন' নামে পরিচিত বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে এই সমিতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। শরীরচর্চা, লাঠিখেলা এবং আত্মরক্ষার অনুশীলন ছিল এর পরিচিত কাজ। কিন্তু সেই অনুশীলনের অন্তরালে তৈরি হচ্ছিল অন্য এক মানসিকতা। পরাধীন দেশের তরুণদের মনে জাগিয়ে তোলা হচ্ছিল আত্মবিশ্বাস, সাহস এবং দেশকে স্বাধীন করার সংকল্প। বাঘাযতীনের কাছে শরীরচর্চা নিছক পেশিশক্তি বাড়ানোর উপায় ছিল না। তাঁর কাছে শক্তিশালী শরীর ছিল শক্তিশালী জাতি গঠনের অন্যতম শর্ত। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লবের যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, তার জন্য প্রয়োজন ছিল সাহসী, শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং আত্মত্যাগে প্রস্তুত একদল তরুণ। পাথুরিয়াঘাটার মতো এলাকায় শরীরচর্চার প্রতিষ্ঠানগুলি সেই মানসিকতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

স্থানীয় ইতিহাসে পাথুরিয়াঘাটার ৭৮ নম্বর বাড়িকে ঘিরে বাঘাযতীনের জীবনের একটি রোমাঞ্চকর ঘটনার কথাও শোনা যায়। কথিত, সেখানে পুলিশি সংবাদদাতা নিবারণ হালদারের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ হয়। গুলির লড়াইয়ে নিবারণ আহত হলেও বাঘাযতীন তাঁকে প্রাণে মারেননি। পরে নিবারণ পুলিশের কাছে খবর পৌঁছে দেন। এরপর কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় বাঘাযতীনকে ধরার জন্য তৎপরতা বাড়ে। এই কাহিনি পাথুরিয়াঘাটার বিপ্লবী স্মৃতিকে আজও আলোড়িত করে।

ইতিহাসে লেখা রয়েছে যে, বিপ্লবী বাঘাযতীনের জীবনাবসান ঘটে ১৯১৫ সালে। কিন্তু তাঁর আদর্শের স্মৃতি পাথুরিয়াঘাটা থেকে মুছে যায়নি। এই এলাকার ব্যায়াম সমিতি বিপ্লবী ঐতিহ্যের ধারক হয়ে রয়েছে। পরবর্তী সময়ে সেই ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত হলো বড় কালীপূজা। ১৯২৮ সালে পাথুরিয়াঘাটা ব্যায়াম সমিতির উদ্যোগে এই পুজোর সূচনা হয় বলে বিভিন্ন প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে। পূজার সূচনার সঙ্গে অতুলকৃষ্ণ ঘোষের নামও জড়িয়ে রয়েছে। ফলে পূজার ইতিহাস বলতে গেলে বাঘাযতীনের বিপ্লবী উত্তরাধিকার এবং সমিতির পরবর্তী প্রজন্মের উদ্যোগ--- দুই দিকই মনে রাখা প্রয়োজন। এই পূজার ইতিহাসে সবচেয়ে উজ্জ্বল অধ্যায়গুলির একটি ১৯৩০ সাল। সেই বছর নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু পাথুরিয়াঘাটা সর্বজনীন কালীপূজা কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন বলে বিভিন্ন সংবাদ প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে। তখন তিনি কলকাতার রাজনৈতিক জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। একই বছর কলকাতার মেয়র হিসেবেও তাঁর নাম ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাঁর সভাপতিত্ব পুজোটিকে কেবল একটি স্থানীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সীমায় আটকে রাখেনি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল জাতীয়তাবাদী চেতনার এক গভীর তাৎপর্য।

নেতাজী ও বিপ্লবী বাঘাযতীনের মধ্যে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সম্পর্কের প্রশ্নটি এক বিষয়, আর তাঁদের আদর্শের ধারাবাহিকতা আরেক। বাঘাযতীন সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনকে আঘাত করতে চেয়েছিলেন। নেতাজীও স্বাধীনতার সংগ্রামে আপোশহীন অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাঁদের সংগ্রামের পদ্ধতি ও সময় এক ছিল না, কিন্তু পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙার আকাঙ্ক্ষা তাঁদের একই বৃহত্তর ইতিহাসের অংশ করে তুলেছে।

পাথুরিয়াঘাটার বড় কালীপূজার আয়োজনেও সেই ইতিহাসের ছাপ খুঁজে পাওয়া যায়। রুপোর খাঁড়া, রুপোর মঙ্গলঘট, গঙ্গাজল এবং পূজার পরদিন অন্নকূটের মতো আচার এই উৎসবের নিজস্ব পরিচয় তৈরি করেছে। বিশাল প্রতিমা, ঐতিহ্যবাহী আয়োজন এবং মানুষের বিপুল সমাগম পূজাটিকে কলকাতার পরিচিত উৎসবগুলির মধ্যে বিশেষ স্থান দিয়েছে। কিন্তু বাহ্যিক জাঁকজমকের আড়ালে এর ঐতিহাসিক গুরুত্বও কম নয়।

একদিকে বিপ্লবী বাঘাযতীনের স্মৃতি, অন্যদিকে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সভাপতিত্ব— এই দুই অধ্যায় পাথুরিয়াঘাটার বড় কালীপুজোকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছে। এখানে ধর্মীয় বিশ্বাস ও দেশপ্রেম পরস্পরের বিরোধী হয়ে ওঠেনি। বরং পূজার সামাজিক পরিসর একসময় বিপ্লবী চেতনার স্মৃতি বহন করেছে। সেই ইতিহাস আজও নতুন প্রজন্মকে মনে করিয়ে দেয়, স্বাধীনতার সংগ্রাম শুধু যুদ্ধক্ষেত্র কিংবা রাজনৈতিক মঞ্চে সীমাবদ্ধ ছিল না। পাড়ার ব্যায়ামাগার, মানুষের মিলনস্থল, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং ধর্মীয় উৎসবের পরিসরেও তার নানা চিহ্ন ছড়িয়ে ছিল।

পাথুরিয়াঘাটার বড় কালীপূজা তাই নিছক প্রতিমা দর্শন কিংবা উৎসবের আনন্দে শেষ হয়ে যায় না। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে এমন এক সময়ের স্মৃতি, যখন দেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন মানুষের দৈনন্দিন জীবনেও আলোড়ন তুলেছিল। বাঘাযতীনের বিপ্লবী আদর্শ থেকে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্ব— ভারতের ইতিহাসের এই সূত্রগুলি মনে রাখলে পাথুরিয়াঘাটার কালীপূজাকে নতুন চোখে দেখা যায়। দেবীর আরাধনার পাশাপাশি সেখানে প্রতিবার যেন ফিরে আসে স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগ করা মহান মানুষদের স্মৃতি। □

উচ্চকাঙ্ক্ষী মূষিককন্যা

এক নদীতে এক ঋষি স্নান করে তর্পণ করছিলেন। হঠাৎ এক বাজপাখির নখর থেকে একটি ইঁদুরছানা ঋষির হাতের ওপর এসে পড়ল। ঋষি দয়াপরবশ হয়ে তপোবল দিয়ে সেই ছোট্টো ইঁদুরছানাটিকে সুন্দর কন্যসন্তানে রূপান্তরিত করে কুটিরে নিয়ে এলেন।

ঋষি ও তাঁর স্ত্রী নিঃসন্তান ছিলেন। তাই তাঁরা পরম স্নেহে সেই কন্যাটিকে লালনপালন করতে লাগলেন। দেখতে দেখতে কন্যাটি এক রূপবতী কুমারীতে পরিণত হলো। যখন তার বিয়ের বয়স হলো তখন ঋষি ভাবলেন আমার অসাধারণ রূপবতী কন্যাকে আমি সবচেয়ে শক্তিশালী পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দেব।



ঋষি প্রথমে সূর্যদেবকে আহ্বান করলেন। সূর্যদেব উপস্থিত হলে ঋষি তার কন্যাকে জিজ্ঞাসা করলেন, মা, ইনি সারা বিশ্বকে আলো প্রদান করেন। তুমি কি একে বিয়ে করবে? মেয়েটি বলল, না বাবা ইনি বড্ডো উত্তপ্ত ও উগ্র। এমন বর আমার পছন্দ নয়।

ঋষি তখন সূর্যদেবকে জিজ্ঞেস করলেন, হে দেব, আপনার চেয়েও শক্তিশালী কে আছে? সূর্যদেব বললেন, ঋষিবর, মেঘ আমার চাইতেও শক্তিশালী। সে চাইলে আমার সমস্ত আলো ঢেকে দিতে পারে।

ঋষিবর তখন মেঘকে আহ্বান করলেন। মেয়েটি মেঘকে দেখে বলল, না বাবা, এ বড্ডো কালো ও ঠাণ্ডা। একে আমার পছন্দ নয়। ঋষি মেঘকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার চেয়ে শক্তিশালী কে আছে? মেঘ বলল, পবনদেব আমার চাইতে শক্তিশালী। সে এক ফুৎকারে আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে।

ঋষি তখন পবনদেবকে আহ্বান করলেন। মেয়েটি পবনদেবকে দেখে মাথা নেড়ে বলল, ইনি বড্ডো চঞ্চল, এক জায়গায় স্থির থাকতে পারে না। একে আমি বিয়ে করবো না। ঋষি পবনদেবকে জিজ্ঞেস করলেন, আপানার চাইতে শক্তিশালী কে?

পবনদেব বললেন, পর্বতরাজ আমার চাইতে শক্তিশালী। আমি প্রচণ্ড বেগে বয়ে গেলেও পর্বতকে এক চুলও নাড়াতে পারি না।

ঋষি তখন পর্বতরাজের কাছে গেলেন। মেয়েটি পর্বতকে দেখে বলল, না বাবা, ইনি বড্ডো শক্ত ও মোটা, নড়াচড়া পর্যন্ত করতে পারে না। আমার একে পছন্দ নয়।

ঋষি এবার পর্বতরাজকে জিজ্ঞেস করলেন, হে পর্বতরাজ, আপনার চেয়েও শক্তিশালী কেউ কি আছে? পর্বতরাজ হেসে বললেন, আমার চেয়ে শক্তিশালী হলো মূষিক (ইঁদুর)। আমি এত বিশাল হওয়া সত্ত্বেও ছোট্টো একটা ইঁদুর আমার বুকে গর্ত বানিয়ে ফেলতে পারে। আর আমি তাকে থামাতে পারি না।

ঋষি তখন এক ইঁদুরশ্রেষ্ঠকে আহ্বান করলেন। ইঁদুরটিকে দেখামাত্রই মেয়েটির চোখ আনন্দে চকচক করে উঠল। তার ভেতরের সুপ্ত ইঁদুরের স্বভাব জেগে উঠল। সে লজ্জায় রাঙা হয়ে বলে উঠল, হ্যাঁ বাবা, ইনিই আমার যোগ্য স্বামী। এর সঙ্গেই আপনি আমার বিয়ে দিন।

ঋষি তখন বুঝতে পারলেন যে, যার যা স্বভাব তা পরিবর্তন করা যায় না। তিনি তাঁর তপোবল দিয়ে মেয়েটিকে আবার আগের মতো ইঁদুরে পরিণত করে দিলেন।

ছোটো বন্ধুরা, বাহ্যিক রূপ বা অবস্থান পরিবর্তন করলেও মানুষের মূল স্বভাব বা প্রকৃতি কখনো বদলানো যায় না। প্রত্যেকে শেষপর্যন্ত নিজের যোগ্য স্থানটিই খুঁজে নেয়।

সংগৃহীত

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ পরিচয়

সোমনাথ



গুজরাটের সৌরাষ্ট্র অঞ্চলের প্রভাসক্ষেত্রে কপিলা, হিরণ ও সরস্বতী— এই তিন নদীর সঙ্গমস্থলে এবং সিন্ধুসাগরের তীরে জ্যোতির্লিঙ্গ সোমনাথ মন্দির অবস্থিত। রাজা দক্ষের অভিশাপ থেকে চন্দ্রদেবকে মুক্ত করতে ভগবান শিব এখানে আবির্ভূত হয়ে সোমনাথ লিঙ্গ রূপে প্রতিষ্ঠিত হন। পুরাণ ও ইতিহাস অনুসারে চন্দ্রদেব প্রথম সোনা দিয়ে এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে ইসলামি আক্রমণকারীরা বারবার এই মন্দির ধ্বংস করেছে এবং হিন্দুরা বারবার পুনর্নির্মাণ করেছে। বর্তমানে সুরম্য ও দৃষ্টিনন্দন মন্দিরটি স্বাধীনতার পর পুনর্নির্মিত হয়েছে। মহাশিবরাত্রি ও কার্তিক পূর্ণিমায় এখানে বিশেষ অনুষ্ঠান হয়।

এসো সংস্কৃত শিখি-১২৭

দশদিবসেষু সংস্কৃতং বদতু

প্রথমদিবসঃ

মম নাম কমলাকান্তঃ। মম নাম– আমার নাম।
(পুং) ভবতঃ নাম কিম্? – আপনার বা তোমার নাম কী?
(স্ত্রী) ভবত্যাঃ নাম কিম্? – আপনার বা তোমার নাম কী?
ভবতঃ (পুং) আপনার বা তোমার। স্ত্রীলিঙ্গে ভবত্যাঃ।
মম নাম কুমারী বীণা ঘোষ ইত্যাদি।

কয়েকটি শব্দ ঃ কৃষ্ণফলকম্-- ব্ল্যাকবোর্ড। খটিকা-- খড়ি। মার্জনী-- ডাস্টার। উৎপীটিকা–টেবিল। আসন্দিকা–চেয়ার। পুস্তকম্--বই। লেখনী--কলম। খাতা–লিপিপুস্তিকা।

ভালো কথা

বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে

গত ৬ অক্টোবর রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক আবাস ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উপরের সভাকক্ষে 'ভারতকেশরী শ্যামাপ্রসাদ' বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে আমি মা-বাবার সঙ্গে গিয়েছিলাম। আমার মা ও দিব্যর মা সমাগত অতিথি অভ্যাগতগের চন্দনের ফোঁটা দিয়ে বরণ করছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তিনজন মন্ত্রী — তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রী ডঃ কল্যাণ চক্রবর্তী, উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী শ্রীজগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় এবং বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীদীপক বর্মন উপস্থিত ছিলেন। আরএকজন ছিলেন, তিনি হলেন স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক আবাস ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সম্পাদক স্বামী জ্ঞানলোকানন্দ মহারাজ। পুস্তক প্রকাশ এবং দুজন মন্ত্রীর ভাষণের পর আমি একটি কবিতা আবৃত্তি করলাম। তাতে মহারাজ খুশি হয়ে 'আমি মা, সকলের মা' বই এবং একটি স্বামীজীর ছবি উপহার দিয়ে আমাকে আশীর্বাদ করলেন। আমি মহারাজ এবং বড়োদের প্রণাম করলাম।

দীপমাল্য সাউ, ষষ্ঠশ্রেণী, রাধা-মাধব সাহা লেন, কলকাতা-৬।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) ক তি থ অ	(১) অ ক কু ক থা থা
(২) চা অ লা তি	(২) ধ অ ন কা বো ল

৭ সেপ্টেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) তাণ্ডবনৃত্য (২) থানকাপড়

৭ সেপ্টেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) হৃদয়বিদারক (২) হরিসংকীর্তন

(১) কৃত্তিকা মণ্ডল, মকদুমপুর, মালদা। (২) মৌমিতা দেবনাথ, নিমতা, কল-৪৯। (৩) পূজা মহান্তি, বরাবাজার, পুরুলিয়া। (৪) শ্রেয়া সরদার, ক্যানিং, দ: ২৪ পরগনা।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/ সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery



PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.
74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556, Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রুপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206
9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond



সংগঠিত, পুরুষার্থসম্পন্ন ও বিজয়শালিনী শক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে সঙ্ঘ এগিয়ে চলেছে : ডাঃ মোহনরাও ভাগবত

গত এক বছর ধরে সঙ্ঘের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি চলেছে। সেই কর্মসূচিগুলির সমাপ্তি উপলক্ষ্যে বিজয়াদশমী উৎসব উদ্‌যাপনের জন্য আজ আমরা এই স্থানে একত্রিত হয়েছি। এই বছর সন্ত শিরোমণি পূজ্য সন্ত রবিদাসজী মহারাজের ৬৫০তম জন্মজয়ন্তী বর্ষ। এই উপলক্ষ্যে সারা দেশে বিভিন্ন কর্মসূচি চলছে। সঙ্ঘের শাখাগুলিতেও সর্বত্র সন্ত রবিদাসজীর জীবন, কর্ম ও চিন্তাধারা সম্পর্কে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে।

যখন আমাদের দেশ অত্যাচারী বিদেশি আক্রমণকারীদের দ্বারা পীড়িত ছিল, যখন নিজের স্বধর্ম অনুসরণকারী নাগরিকদের উপর চরম অত্যাচার চলছিল এবং সর্বত্র আতঙ্কের পরিবেশ বিরাজ করছিল, সেই সময় সন্ত রবিদাসজী স্বধর্মনিষ্ঠা, সামাজিক সমরসতা ও ভক্তির ব্যাপক প্রচার করেছিলেন। নিজের জীবনের উদাহরণের মাধ্যমে তিনি সেই সময়ের সমাজকে একপ্রকার আশ্বাস দিয়েছিলেন, সমাজের সাহস বাড়িয়েছিলেন এবং সমাজের গুণগত মান বজায় রেখেছিলেন। স্বধর্ম রক্ষার জন্য আত্মবলিদানকারী আরও দুই মহাপুরুষকে আজ স্মরণ করা সমীচীন হবে। আর্যসমাজের প্রখর সন্ন্যাসী, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, শুদ্ধি আন্দোলনের জনক ও স্বাধীনতা সংগ্রামী স্বামী শ্রদ্ধানন্দজীর বলিদানের ১০০ বছর পূর্ণ হয়েছে। একইভাবে, ওড়িশায় বনবাসী ভাইদের মধ্যে থেকে তাঁদের সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গকারী এবং সেখানেই স্বধর্মরক্ষার বোধ জাগ্রত করার লক্ষ্যে প্রয়াসী থেকে আত্মবলিদানকারী স্বামী লক্ষ্মণানন্দজী সরস্বতী মহারাজেরও জন্মশতবর্ষ চলছে। গত ১১ এপ্রিল থেকে মহাত্মা ফুলেজীর ২০০তম জন্মজয়ন্তী বর্ষও শুরু হয়েছে।

একইভাবে, আত্মবোধ জাগ্রতকারী বঙ্গের রাজনারায়ণ বসু নিজের সমাজকে সংগঠিত করার একটি পরিকল্পনা সামনে রেখেছিলেন। 'স্ব'-এর বোধ জাগ্রত করার জন্য তিনি তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে স্বদেশি মেলার আয়োজন শুরু করেছিলেন। তাঁরও ২০০তম জন্মবর্ষ চলছে। এই মহাপুরুষদের স্মরণ করা বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। কারণ, গত ১০০ বছর ধরে সঙ্ঘ যে কাজ করে চলেছে, তা আসলে এই 'স্ব'-এর বোধ জাগ্রত করারই কাজ। এই 'স্ব'— দেশ, জাতি, সমাজের আত্মপরিচয় ও ইতিহাসের ভিত্তিতে ভারতকে সংগঠিত ও শক্তিসম্পন্ন করে তোলার উদ্দেশ্যেই এই কার্যক্রম এগিয়ে চলেছে।

'স্ব'-এর বোধ ও আবেগগত ঐক্য : পঞ্চপরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো স্ববোধ জাগ্রত করা এবং 'স্বদেশি'র আচরণে অভ্যস্ত হওয়া। এই স্ববোধের প্রতিফলন আমরা ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় দেখতে পাই, যেখানে আমরা নিজেদের পরিচয় দিয়েছি 'আমরা, ভারতের জনগণ' বলে। আমাদের এই 'আমরা'-র অনুভূতি, আমাদের এই 'স্ব'-এর চেতনা হলো প্রকৃতপক্ষে আমাদের আবেগগত বন্ধন। এই বন্ধনের কারণেই এত বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ একটি দেশ প্রাচীনকাল থেকে এক দেশ, এক সমাজ এবং এক রাষ্ট্র হিসেবে এগিয়ে এসেছে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা সমগ্র অস্তিত্বের ঐক্য উপলব্ধি করেছিলেন। সেই উপলব্ধির ভিত্তিতে সকলের মধ্যে আপনত্বের আচরণ গড়ে তোলার জন্য বহু স্তরে বিকশিত এক উৎকৃষ্ট দর্শনের উত্তরাধিকার আমরা ভারতবাসীরা পেয়েছি। আমরা যখন এই সত্য ভুলে গিয়েছিলাম, তখনই আমাদের পতন হয়েছিল। আমরা বিভক্ত ও দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম।

ফঃ ৬

এরপর ক্রমশ এমন অবস্থায় নেমে গিয়েছিলাম যে, আমাদের শত শত বছর ধরে পরাধীনতার শৃঙ্খল সহ্য করতে হয়েছিল।

এখন বহু মহাপুরুষের ভগীরথপ্রয়াস ও আত্মবলিদানের পর আমরা সেই পরাধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে ঐক্য ও উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছি। আমাদের আবেগগত বন্ধনকে ক্রমাগত আরও দৃঢ় করার নির্দেশ ভারতীয় সংবিধানের শাসন পরিচালনার 'নির্দেশমূলক নীতি' সংক্রান্ত অধ্যায়েও বর্ণিত হয়েছে। তাই এই আবেগগত বন্ধনকে আমাদের আবার স্মরণ করতে হবে— এটি আসলে কী, তা স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে এবং এর গুণাবলীকে নিজেদের জীবনে গ্রহণ করতে হবে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও এর অনুশীলন করতে হবে। দেশের স্বাধীনতার সময়কার পরিস্থিতি আজকের পরিস্থিতি থেকে আলাদা ছিল। প্রধান অতিথি শ্রী সঞ্জয়জী গুপ্তা বলেছেন— সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার সময়কার পরিবেশও ভিন্ন ছিল। সেই সময় আমাদের স্বাধীন করার জন্য যে মহাপুরুষেরা প্রচেষ্টা করেছিলেন এবং সমাজকে যে তপস্যা ও আত্মনিবেদন করতে হয়েছিল, আজকের পরিস্থিতিতে এই কাজ সম্পন্ন করতে হলে তার তুলনায় বহুগুণ বেশি প্রচেষ্টা প্রয়োজন হবে।

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সনাতন ভিত্তি : আমাদের ভারত বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ একটি দেশ। এখানে প্রকৃতির নানা ধরনের বৈচিত্র্য রয়েছে। পন্থ, প্রদেশ, জাতি, ভাষা, খাদ্যাভ্যাস ও আচার-আচরণেও বৈচিত্র্য রয়েছে। এই দেশকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যেতে হবে, যেভাবে অতীতে এগিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এগিয়ে চলবে। এর জন্য এমন একটি মৌলিক ভিত্তি প্রয়োজন, যা এই সমস্ত বৈচিত্র্যকে স্বীকার করবে, সকলের সম্মান রক্ষা করবে এবং প্রত্যেকের মর্যাদা ও নিরাপত্তার বিষয়ে সচেতন থাকবে। আমাদের কাছে এখন ভিত্তি কোনটি? বিশ্বে প্রচলিত বিভিন্ন চিন্তাধারার মধ্যে এমন কোনো ভাবনা সহজে দেখা যায় না। সৌভাগ্যবশত, এমন চিন্তাধারা আমাদের নিজস্ব পরম্পরায় রয়েছে। অনাদিকাল থেকে চলে আসা আমাদের পরম্পরা কেবল পরম্পরা হিসেবেই টিকে নেই— এই পরম্পরার সত্যকে যাঁরা উপলব্ধি করেছেন, এমন মহাপুরুষেরা আমাদের মধ্যে নিরন্তর আবির্ভূত হয়েছেন এবং আজও হচ্ছেন। এই পরম্পরা কেবল কাগজে লেখা কিংবা মনে কল্পনা করা কোনো বিষয় নয়, বরং প্রত্যক্ষভাবে দেখা ও অনুভব করা সত্য। আমাদের পরম্পরা বলে যে, সৃষ্টির মধ্যে বৈচিত্র্য রয়েছে। এই বৈচিত্র্য সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, কিন্তু পরিবর্তনশীলও। বৈচিত্র্য যেমন স্বাভাবিক ও পরিবর্তনশীল, তেমনই তা সমগ্রতারও অংশ। আর এক অস্তিত্বের ঐক্যের সত্য অচল, অটল ও শাশ্বত।

ঈশ্বর মানুষকে চিন্তা করার ক্ষমতা দিয়েছেন। চিন্তার পরিশুদ্ধি ঘটিয়ে মানুষ যদি এই সত্যকে নিজের অন্তরে উপলব্ধি করতে পারে, পৃথিবীর মধ্যেও এই সত্যকে প্রত্যক্ষ করতে পারে এবং সেই অনুযায়ী জীবনযাপন করে— তবে তার মধ্য দিয়েই সে শাশ্বত ও নিত্যসুখ লাভ করতে পারে। সেই পরম সুখ লাভ করাই মানবজীবনের লক্ষ্য। এর জন্য প্রয়োজন সংযম ও ত্যাগে পরিপূর্ণ জীবন; এমন জীবন যা সমগ্র বিশ্বকে নিজের পরিবার বলে মনে করে এগিয়ে চলে। এটাই আমাদের পরম্পরাগত বিশ্বাস। বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও আমাদের এই বিশ্বাস এক ও অভিন্ন। এই সত্যকেই ভারতীয় ঋষিরা বেদে বিভিন্ন পন্থ ও দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকাশ করেছেন। উপনিষদের মাধ্যমে মানুষকে কাছে বসিয়ে এই সত্যকে বুঝিয়ে বলা হয়েছে। মঠ, মন্দির কিংবা গুরুদ্বার— যেখানেই যান না কেন, ভারতীয় চিন্তাধারায় আপনি এই একই জ্ঞান ও সৎসঙ্গের সন্ধান পাবেন। সমস্ত বৈচিত্র্যকে সম্মান করা এবং সকলকে সুরক্ষা দেওয়া আমাদের পরম্পরায় বহমান এক স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য।

বৈচিত্র্য পরিবর্তনশীল। তাই জীবনে যা পরিবর্তনশীল, সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাকেও পরিবর্তিত হতে দিতে হবে এবং যা শাশ্বত— তাকে সর্বদা অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। এই নমনীয়তাও আমাদের সনাতন দৃষ্টিভঙ্গিরই ফল। নিজের ভাষা, জাতি, পন্থ ও সমাজের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক অনুরাগ থাকে। কিন্তু যখন এই সমস্ত পরিচয়ের ঊর্ধ্বে আমাদের আবেগগত ঐক্য এবং ভারতীয় জাতীয়তার বোধ সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছিল, তখন আমরা বিশ্বের সামনে প্রতিটি দিক থেকে আদর্শ ছিলাম। যখন আমরা এই সত্য ভুলে গেলাম, তখন পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক ও আপনত্বের অনুভূতিও ভুলে গেলাম। আমরা বিচ্ছিন্ন ও দুর্বল হয়ে পড়লাম। দুর্বল হয়ে পড়লে মানুষের মনে ভয় জন্মায়— তার অস্তিত্ব আদৌ টিকে থাকবে কি না, সেই আশঙ্কা দেখা দেয়। দুর্বল মানুষ নিজেকে দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলে। আমরাও নিজেদের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলেছিলাম। 'কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্'-এর কথা বলা আমরা সমুদ্রযাত্রা- সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা-সহ নানা বিধিনিষেধের বন্ধনে আটকে পড়েছিলাম। দুর্বল হয়ে পড়ার পর মানুষ যখন নিজের অস্তিত্ব জাহির করতে চায়, তখন তার মধ্যে অহংকারও জন্ম নিতে পারে। আমাদের মধ্যেও অহংকারের জন্ম হয়েছিল। আর এই সমস্ত কিছুর পরিণতি হিসেবে আমাদের দুরবস্থা সামনে এসেছিল।

শতবর্ষের কর্মসূচি ও জনসম্পর্ক অভিযান : নিজের অস্তিত্ব ও আত্মপরিচয়কে স্মরণ করা— এই আবেগগত ভিত্তিকে মনে রেখে সংগঠিত থাকা এবং পরস্পরের কল্যাণের জন্য সংকল্পবদ্ধ জীবনযাপন করা, এই কাজ আমাদের করতেই হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই সঙ্ঘ গত ১০০ বছর ধরে কাজ করে চলেছে। গত বছর সঙ্ঘের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। সঙ্ঘের শাখার বিস্তার এবং সঙ্ঘের সঙ্গে সমাজের যোগাযোগ বৃদ্ধি করাই ছিল এই কর্মসূচিগুলির লক্ষ্য। বিশ্বে ভারতের অবস্থান ক্রমশ সুদৃঢ় হচ্ছে এবং সঙ্ঘের প্রতিও মানুষের বিশ্বাস বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভারত, হিন্দুসমাজ ও সঙ্ঘ সম্পর্কে সঠিক তথ্য পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই সারা দেশে জনসম্পর্ক অভিযান পরিচালিত হয়েছে। আমরা ভারতের ৪,৬১,৫২৭টি গ্রাম ও ৪১,৭৬০টি বসতিতে পৌঁছেছি। ১,০১৭টি জেলায় প্রবুদ্ধ নাগরিকদের নিয়ে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে ৪,২৬,৪৯৭ জন প্রবুদ্ধ নাগরিক উপস্থিত ছিলেন। ৫৩৬টি খণ্ডে বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের প্রধানদের নিয়ে সদ্ভাবনা বৈঠক হয়েছে। ৩৪,১৮৭টি মণ্ডলে হিন্দু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং যুব সম্মেলনগুলিতে উপস্থিত ছিলেন ৩৯,২৫,২২৫ জন যুবক-যুবতী।

ভারতের প্রতি বিশ্বজুড়ে ক্রমবর্ধমান কৌতূহল : বিশ্বে ভারত সম্পর্কে নতুন কৌতূহল জাগছে। দেশ যত এগিয়ে চলেছে, ভারত সম্পর্কে মানুষের আগ্রহও তত বাড়ছে। জড়বাদ, ব্যক্তিবাদ ও সংযমহীন ভোগের ওপর প্রতিষ্ঠিত পাশ্চাত্য জীবনদৃষ্টির অসম্পূর্ণতা থেকে যে সমস্যাগুলি সৃষ্টি হয়েছে— সেগুলি নিয়ে সেখানকার মানুষ উদ্বিগ্ন। বস্তুগত দিক থেকে সর্বসুবিধাসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও এই সমস্যাগুলি তাঁদের চিন্তায় ফেলছে। উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণকে কীভাবে একসঙ্গে

এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়? পারিবারিক জীবন ও সংস্কারগুলির ক্রমাগত অবক্ষয় কীভাবে রোধ করা যায়? এই সমস্যাগুলির উত্তর তাঁদের কাছে নেই। বিশ্ব জানে— এই সমস্যাগুলির উত্তর ভারতের কাছে রয়েছে। তাই ভারত যখন এগিয়ে চলেছে, তখন ভারত কী বলতে চায়, তা বিশ্ব অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনছে।

পঞ্চপরিবর্তনের বিষয়টি সর্বত্র স্বীকৃতি পাচ্ছে। বিশেষত পরিবার প্রবোধন, নাগরিক কর্তব্যবোধ ও পরিবেশ সংরক্ষণের মতো বিষয়গুলি মানুষ সহজেই গ্রহণ করছেন। কিন্তু এটি কেবল এক বছরের কর্মসূচি নয়। প্রত্যক্ষ কাজের মাধ্যমে এগুলিকে আমাদের অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। একটি ইংরেজি প্রবাদে বলা হয়েছে—'Sow a thought, reap an action; sow an action, reap a habit; sow a habit, reap a character.' অর্থাৎ একটি চিন্তার বীজ বপন করলে কর্মের জন্ম হয়; কর্মের বীজ বপন করলে অভ্যাস তৈরি হয়; আর অভ্যাসের বীজ বপন করলে চরিত্র গড়ে ওঠে। তাই সৎকর্মকে অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। অভ্যাসের নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে তা একসময় স্বভাবে পরিণত হয়। এই বিষয়গুলিকে নিজেদের আচরণ ও পারিবারিক রীতিনীতির অংশ করে নিয়ে এগিয়ে চলতে হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি হচ্ছে, কিন্তু সমাজমাধ্যমের দ্বারা সকলের কাছে পৌঁছে যাওয়া তথ্যকে যথাযথভাবে গ্রহণ ও উপলব্ধির বিবেচনাবোধ আমাদের রয়েছে কি? কোনটি উচিত এবং কোনটি অনুচিত— সেই পার্থক্য বোঝার বিবেচনাবোধ না থাকলে তার দুষ্পরিণাম হয়। এই বিবেচনাবোধের অভাবেই মাদকদ্রব্যের সমস্যা তৈরি হয়েছে, যা আজ একটি গুরুতর জাতীয় সমস্যায় পরিণত হয়েছে। নতুন প্রজন্মকে এই ধরনের বিষয় থেকে দূরে থাকার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

প্রযুক্তি, পরিবেশ ও নৈতিকতার গুরুত্ব : প্রযুক্তি আসবে, তাকে আটকে রাখা অর্থহীন। কিন্তু প্রযুক্তি ব্যবহারকারীর বুদ্ধি কী চিন্তা করছে— সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। শুধু ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করলে কী হতে পারে, তা আমরা দেখতে পাচ্ছি। হিমালয় অঞ্চলে একপেশে উন্নয়নের ফলে প্রকৃতির ভারসাম্য সর্বত্র বিঘ্নিত হয়েছে। নেপালে যে ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটেছে, তা এই ধরনের উন্নয়নেরই পরিণতি। অর্থনীতির পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষা ও নৈতিকতার বিষয়টিও বিবেচনা করতে হবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-এর মতো প্রযুক্তি আসছে, তাই আমাদের তার ব্যবহার শিখতে হবে। কিন্তু প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নৈতিকতা অনুসরণ করা না হলে, সেই একই 'এআই' ব্যবহার করে কত ধরনের ভুয়ো ভিডিয়ো তৈরি করা হচ্ছে, তা আমরা দেখতে পাচ্ছি।

হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভারতীয়ত্বের তিনটি ভিত্তি : ভারতকে সনাতন দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে সামগ্রিক ও একাত্ম উন্নয়নের নিজস্ব নতুন প্রতিমান গড়ে তুলতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গিকেই আমরা 'হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গি' বলে জানি। হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো বিশেষ উপাসনাপদ্ধতি, খাদ্যাভ্যাস, রীতিনীতি কিংবা মতাদর্শকে বাধ্যতামূলক বলে মনে করা হয় না। এর বৈশিষ্ট্য হলো— বিশ্বভ্রাতৃত্ব, আধ্যাত্মিকতা ও মানবতা। 'ভা' অর্থাৎ তেজের উপাসনায় রত 'ভারত' থেকেই ভারতীয়ত্বের এই ব্যাখ্যা গড়ে উঠেছে। এই ভাবকেই আমরা 'হিন্দুভাব' বলে থাকি। ভারতে এই ভাবের অনুশীলন তিনটি রূপে প্রকাশ পায়। প্রথমত, ভারতমাতার প্রতি ভক্তি। দ্বিতীয়ত, আমরা সকলেই একই পূর্বপুরুষের উত্তরসূরী। তৃতীয়ত, আমাদের সংস্কৃতির শাশ্বত মূল্যবোধের ভিত্তিতে সময়ের প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেদের জীবনকে ক্রমাগত গড়ে তোলা।

আমরা সকল ভারতবাসী এক এবং আমাদের ঐক্য— হৃদয়ের ঐক্য। এটি কোনো লেন-দেন কিংবা চুক্তির ভিত্তিতে তৈরি হয়নি। স্বাধীনতা সংগ্রামীরা এই নিঃশর্ত ঐক্যের প্রেরণায় নিজেদের সমগ্র জীবন জনকল্যাণের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘও এই একই ভাব জাগ্রত করতে চায়। পশ্চিম থেকে এমন এক ঝড় এসেছে, যা সব ধরনের ব্যবস্থা, মঙ্গলময়তা, সংস্কৃতি, সংস্কার ও মানবিক মূল্যবোধের বিরোধিতা করে সেগুলিকে ধ্বংস করতে চায়। ফ্রান্স, আলবেনিয়া, বাংলাদেশ ও নেপালে যা ঘটেছে— তার পিছনে এই ধরনের শক্তির ভূমিকা রয়েছে। 'ভারত'ই তাদের লক্ষ্য। তারা নানা উপায়ে চেষ্টা করে কীভাবে ভারত, হিন্দু সমাজ ও সঙ্ঘকে বিভক্ত করা যায়। সংকীর্ণ ক্ষমতালিপ্সা ও ব্যক্তিস্বার্থে পরিচালিত নেতারাও তাদের সহযোগী হয়ে ওঠেন।

সামাজিক ঐক্য, জনকল্যাণ ও জাতীয় কর্তব্য : গণতন্ত্রে আন্দোলন হবে— এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আন্দোলন হওয়া উচিত সমস্যার সমাধানের জন্য। আন্দোলনের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান খুব কম ক্ষেত্রেই হয়; প্রকৃত সমাধান আসে সমাজের সম্মিলিত উদ্যোগের মাধ্যমে। ব্রিটিশ শাসনকালে বড়লাট কার্জন হিন্দু-মুসলমানের ভিত্তিতে সমাজকে বিভক্ত করার উদ্দেশ্যে 'বঙ্গভঙ্গ' করেছিলেন। কিন্তু তখন দেশ, জাতি, সমাজের ঐক্যের মূলমন্ত্র কার্যকর ছিল। দেশজুড়ে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি উঠেছিল এবং তা স্বাধীনতার প্রেরণা হিসেবে সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। এর চার বছর পর ব্রিটিশ সরকারকে বঙ্গভঙ্গ প্রত্যাহার করতে হয়েছিল। কিন্তু ১৯৪৭ সালে তা সম্ভব হয়নি। কারণ, ততদিনে আমরা এই ধারণার কবলে পড়ে গিয়েছিলাম যে, মুসলমানদের উপাসনাপদ্ধতি আলাদা, তাই আমরা আলাদা। এর ফলে দেশভাগ হয়েছিল। দেশভাগের পরিণতিতে সৃষ্ট অশান্তি, পারস্পরিক অবিশ্বাস ও নিরাপত্তাহীনতা আজও বিদ্যমান।

আমাদের নিজেদের ছোটো ছোটো অহংকার ভুলে যেতে হবে। ভারতভক্তি, পূর্বপুরুষদের গৌরব ও ভারতীয় সংস্কৃতি— এই তিনটি সূত্র আমাদের সকলকে একসূত্রে যুক্ত করে। এই তিনটি বিষয়কে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করা এবং দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করার মানসিকতা গড়ে তোলা আমাদের কর্তব্য। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও পেশাগত জীবনে প্রতিদিন ছোটো ছোটো সৎকর্মের মাধ্যমে পরিবর্তন আনতে হবে। এমন একটি পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে, যেখানে সমাজের সাধারণতম মানুষটিও নিজের কর্তব্য পালন করবেন। এর কোনো শর্টকাট নেই। যখনই কোনো দেশ মহান হয়ে উঠেছে, তখন তার সমগ্র সমাজ সম্মিলিতভাবে সেই লক্ষ্যে প্রচেষ্টা করেছে। সঙ্ঘ এই ধরনের সংগঠিত, পুরুষার্থী ও বিজয়শালিনী শক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে।

'সাধ্য করনা হ্যায় হমে কেশব-প্রদর্শিত ধ্যেয়-স্বপ্না,
বস উসী কী পূর্তি কে হিত হো সমর্পিত জন্ম অপনা।
তুষ্ট মাতা হোগী তভী তো বিশ্ব মে সম্মান পাকর,
বঢ় রহে হ্যায় চরণ অগণিত বস ইসী ধুন মে নিরন্তর।'

॥ ভারতমাতার জয় ॥

(নাগপুরে শ্রীবিজয়াদশমী উৎসব উপলক্ষ্যে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ)

সাবধান নকল তালমিছরি কিনে ঠকবেন না

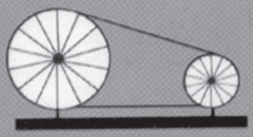

স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও
বাংলার ঘরে ঘরে ছিল
বিশ্বস্ত একটাই নাম



চির পরিচিত
দুলালের®
তালমিছরি

আজও তার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ বাংলার প্রতিটি ঘরেই।
সাধারণ অল্প সর্দি - কাশিতে দুলালের তালমিছরি চুষে
খাওয়াই যথেষ্ট। আর সর্দি - কাশি বেশী হলে একটা
লবঙ্গ ও একটু আদা সহ দুলালের তালমিছরি
এক সঙ্গে ফুটিয়ে চায়ের মতন দু' বার খান
— দারুণ কাজ দেবে।

ভারত সরকারের R চিহ্ন দেখে তবেই কিনুন

দুলালের তালমিছরি — সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরী

দুলালের তালমিছরি ৪, দত্তপাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৬, ফোন - ২২১৮ ৫৬৭৩, ২২১৮ ০৫৪৩



বিদায় নানা পাটেকর

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আর কেউ গলা ফেটে বলবে না— 'এক গেলাস জল দে!' গত ৮ অক্টোবরের সকালটা অন্যরকমভাবে শুরু হলো। গোয়ার একটা ঘরে, ভোরের আলো ফোটার আগেই, থেমে গেল একটা কণ্ঠস্বর। নানা পাটেকর আর নেই। ৭৫ বছর বয়সে জীবনদীপ নিভে গেল চলচ্চিত্র জগতের এই মহীরুহের। বিশ্বাস করতে সকলেরই কষ্ট হচ্ছে। কারণ যাঁকে ভারতবাসী পর্দায় দেখেছে, তিনি তো কখনও ক্লান্ত হতেন না। তিনি চীৎকার করতেন, গর্জে উঠতেন, আবার পরের মুহূর্তে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাসে পুরো প্রেক্ষাগৃহ নিস্তব্ধ করে দিতেন। সেই মানুষটাই আজ চিরকালের জন্য চুপ করে গেলেন। নানা শুধু অভিনয় করতেন না। তিনি চরিত্রটাকে নিজের শরীরে, নিজের রক্তে ঢুকিয়ে নিতেন। প্রথম জীবনে আর্ট ফিল্মে অভিনয় করলেও অভিনেত্রী স্মিতা পাটিল তাঁকে কমার্শিয়াল সিনেমায় অভিনয়ের ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করেন। ১৯৮৪ সালে মুক্তি পায় তাঁর প্রথম ব্লকবাস্টার ছায়াছবি— 'আজ কী আওয়াজ'।

'পরিন্দা'র আন্না যখন পর্দায় এল, দর্শকরা যেন একটু ভয় পেয়েছিলেন। অথচ সেই ভয়ের ভেতরেই কোথাও একটা ভাঙা মানুষ লুকিয়ে ছিল, যাঁকে ঘৃণা করতে গিয়েও তাঁরা পারেননি। 'শক্তি : দ্য পাওয়ার' সিনেমায় ভূস্বামী নরসিংহের চরিত্রে নানা-র অভিনয় অনেক দর্শকের বুকে যেন কাঁপন ধরিয়ে দেয়। এটাই নানার জাদু। তিনি খলনায়ককেও এমন মানুষ করে তুলতেন যে, তার জন্য বুকের ভেতর কোথাও ব্যথা করত। 'ক্রান্তিবীর'-এ তাঁর সেই ক্ষুব্ধ, ক্ষতবিক্ষত চীৎকার আজও সকলের কানে বাজে। তিনি সেদিন সমাজের সামনে একটা আয়না তুলে ধরেছিলেন। অনেকে সেখানে নিজেদের মুখ দেখে অস্বস্তিতে সরে এসেছিলেন। এত বছর পরেও সেই আয়নাটা ঝাপসা হয়নি। 'খামোশি : দ্য মিউজিক্যাল'-এর বাবাকে মনে আছে? যাঁর মুখে কথা নেই, শুধু চোখ আছে। সেই চোখ দু'টো কতটা ভালোবাসা ব্যক্ত করতে পারে, নানা আমাদের শিখিয়েছিলেন। শব্দহীন অভিনয়েও যে এত গভীর কান্না লুকিয়ে থাকে, তা আগে জানা ছিল না। 'প্রহার'-এ তিনি সৈনিকের শৃঙ্খলা আর দেশের প্রতি ভালোবাসাকে এক করে দেখিয়েছিলেন। সেটা সম্ভব হয়েছিল কারণ ওই উর্দিটা তাঁর কাছে শুধু সাজ ছিল না।

'তিরঙ্গা'তে পুলিশ ইন্সপেক্টর শিবাজীরাও বাঘলে-র চরিত্রে নানা হয়ে উঠেছিলেন অনবদ্য। সন্ত্রাসবাদ দমনের লক্ষ্যে শিবাজীরাও বাঘলে-র মরণপণ লড়াই দর্শকরা কোনোদিন ভুলবেন না। অ্যাকশন ক্রাইম ফিল্ম 'যশবন্ত'-এ ইন্সপেক্টর যশবন্ত লোহারের চরিত্রে অসাধারণ নানা পাটেকর। 'আব তক ছাপ্পন'-এর সাধু আগাশে ছিলেন ক্লান্ত, নিঃসঙ্গ, ভেতরে ভেতরে ক্ষয়ে যাওয়া এক মানুষ। আর সেই একই মানুষ 'ওয়েলকাম'-এর উদয় শেট্টি হয়ে দর্শকদের হাসাতে হাসাতে চোখে জল এনে দিয়েছেন। অ্যাকশন-থ্রিলার ছবি— 'দ্য অ্যাটাক্স্ অফ ২৬/১১'তে ২০০৮-এ মুম্বইয়ে সন্ত্রাসবাদী হামলার সময়ে মুম্বই পুলিশের জয়েন্ট কমিশনার (ক্রাইম) রাকেশ মারিয়ার ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয় করেন নানা পাটেকর। তিনি একমাত্র অভিনেতা যিনি দেশ রক্ষার্থে কার্গিলযুদ্ধে সেনাবাহিনীর সঙ্গে কাজ করেছিলেন।

ভয়, হাসি, কান্না, ক্ষোভ, রাগ, অভিমান— সবই তাঁর হাতে এমন সহজে ধরা দিত, যেন জীবনের সব রং তাঁর কাছেই জমা ছিল। আর 'নটসম্রাট'। সেই চরিত্রটা যেন নানার নিজের জীবনেরই আভাস। মঞ্চের রাজা, যিনি শেষ বয়সে একা। আজ যখন তাঁর জীবন সম্পর্কে কেউ পর্যালোচনা করবেন, তখন দেখবেন কী অদ্ভুত মিল! সম্রাট চলে গেলেন, অথচ আমরা তখনও তাঁর সংলাপের রেশেই বসে আছি। কিন্তু পর্দার বাইরের নানা আরও বড়োমাপের মানুষ ছিলেন। আদ্যন্ত জাতীয়তাবাদী এই অভিনেতার ব্যক্তিগত জীবন ছিল সম্পূর্ণ অনাড়ম্বর। মুম্বইয়ের এক সাধারণ ফ্ল্যাটে ছিল তাঁর জীবন, কোনো তারকার দম্ভ ছাড়াই। আর 'নাম ফাউন্ডেশন'-এর মাধ্যমে তিনি পাশে দাঁড়িয়েছিলেন মহারাষ্ট্রের খরাপীড়িত কৃষকদের— ক্যামেরা ছাড়া, প্রচার ছাড়া। যিনি পর্দায় বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার বিরুদ্ধে এত ক্ষোভ দেখিয়েছেন, বাস্তবে তিনি সেই ক্ষোভকে কাজে বদলে দিয়েছেন। জৈব কৃষি, বৃষ্টির জল সংরক্ষণ, গোপালনের মতো বিভিন্ন প্রকল্পে নীরবে, নিভৃতে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন তিনি। কত কৃষকের ঘরে আজ চুলো জ্বলছে তাঁর হাত ধরে— তার হিসাব কেউ রাখেনি। নানা নিজেও রাখতে চাননি। সেই মানুষটা আজ আর নেই। রয়ে গেল সেলুলয়েডের এক বিশাল শূন্যতা। আর কোনো পর্দায় ওই খসখসে কণ্ঠস্বর বুকে বিঁধবে না, ওই তীক্ষ্ণ চাহনি দর্শকদের পরস্পর মুখোমুখি দাঁড় করাবে না, ওই রুক্ষ মানুষটার আড়ালের কোমলতা আর কাউকে ধরা দেবে না। তবু আমরা জানি— নানা পুরোপুরি যাননি। প্রতিটি পুরোনো ছবিতে, প্রতিটি সংলাপে, প্রতিবার যখন কোনো তরুণ অভিনেতা সত্যিকারের তীব্রতা খুঁজবে, নানা সেখানেই থাকবেন। বিদায়, নানা। আপনার নীরবতা আজ সকল ভারতীয়ের হৃদয়ে সবচেয়ে জোরে ধ্বনিত হচ্ছে। □

With Best Compliment From

Our Services

- Patent
- Copyright
- Trademark

itag
POWER OF IDEAS

Your IP Partner
ITAG BUSINESS SOLUTIONS LTD
+91 80170 37767

With Best Compliments from :

Maliram Singhania Charitable Trust

7B, Kiransankar Roy Road
2nd Floor, Kolkata - 1

With Best Compliments From :-

Shree Enterprises (Coal Sales) Pvt. Ltd.

Coal Merchants & Commission Agents

P-31, CIT Road, Sch. VIM (S) Phoolbagan
(Near Phoolbagan Metro Station), Kolkata - 700 054
M. - 8910331350

With Best Compliments From -

UMESH GANERIWALA

033 - 2235 5310
https://sntes.in/
sntescal@yahoo.com

ESTD 1958

SHREE NURSING TIMBER & ELECTRIC STORES

Serving the nation since 60+ years

GLOSTER · APAR · DIAMOND CABLES · RPG CABLES (A Division of KEC International Limited) · DENSONS · Crompton Lighting · ORIENT LIGHTING · C&S electric · :hager

Remson Prime CSA Agent



18, Rabindra Sarani, 2nd Floor, Poddar Court
Gate No. 4, Room No. 7 & 8, Kolkata - 700 001
Ph.: 6618 3088, M : 98300 88272, 98305 44455

With Best Compliments From :-

EAST INDIA TRANSPORT AGENCY

(A Unit of E.I.T.A. India Limited)

20B, Abdul Hamid Street

4th Foor, Kolkata - 700 069

Phone : Nos. 22483203

Fax No. 22483195

Email : eita.cal@eitain.com

With Best Compliments From -

Laghu Udyog Bharati, Delhi State

DIWAN CHAND GUPTA
President
All India Organisation in Service of Small Scale Industries
Mobile 9311144175, 9811044175
48, Deen Dayal Upadhyay Marg
Rouse Avenue, New Delhi - 110002
E-mail : lubheadoffice@gmail.com
Website : www.lubindia.com
Phone : (off.) 011-23215084, 23238682, 23218052

With Best Compliments From -

DURGA TRADING CO.

40, Strand Road, 4th Floor, (Room No. 4)
Kolkata - 700 001
Phone : 2243 1722, E-mail : aksadt_saboo_@yahoo.co.in
Deals in :
BAMBOO, HARDWOOD, BAMBOO CHIPS &
OTHER RAW MATERIALS FOR PAPER MILLS

With Best Compliments from -

Kaka Ram Babu Ram Aggarwal

Office : B-XXIII / 2891, Link Road, Near Samrala Chowk, Ludhiana

Ph. : 2604287, 5031390, Fax : 0161-5021390, Mob. :98763-20448

E-mail : dhruv@krbr.in